বিজ্ঞাপন।

স্কুল সমূহের প্রধানতম ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ্ উড্রো এম, এ, মহোদযের অনুমতি লইয়া আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হই। সঙ্কলন বিষয়ে উক্ত মহাত্মার নিকট বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

অনবকাশ বশতঃ গ্রন্থখানি সর্ব্বপ্রকার দোষ শূন্য করিয়া তুলিতে পারিলাম না। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদি সাধারণেব বোধগম্য করিবার প্রয়াসে, সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই পুস্তক স্কুলের ছাত্রদিগেব পাঠ্য হইবে বলিয়া, ইহাতে বিবাহ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইল না। স্বাস্থ্য-রক্ষা অতি কঠিন বিষয়; ইহার সমুদায় নিয়ম একত্র করিতে গেলে, গ্রন্থের আকার বৃহৎ হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় কতিপয় সাধারণ নিয়ম মাত্র সঙ্কলিত হইল।

এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন এই যে, কোন স্থানে ভ্রম লক্ষিত হইলে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণকালে, সকৃতজ্ঞ-চিত্তে তাহা সংশোধন করিয়া দিব।

আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কৃত "নরদেহ নির্ণয়" গ্রন্থ হইতে অনেক শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিমধিক মিতি।

কলিকাতা।
১০ই জানুয়ারি।
১৮৬৪।

শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য রক্ষা।

উপক্রমণিকা।

আমাদের দেশ জ্বর, ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে কতশত গ্রাম এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণেও নানা স্থান পীড়ার আতিশয্য বশতঃ বাসের অযোগ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি কারণে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে ও কি উপায়েই বা তাহাদের প্রতিবিধান হয়, তদ্বিষয়ে অনেকেই ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে আমরা রোগ ও মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছি তাহা অনেকেই বুঝেন না, কেহ কেহ অল্প পরিমাণে বুঝিয়াও অভ্যাস ও অবস্থা দোষে নিয়ম পালন করিয়া উঠিতে পারেন না। অনেকে বিবেচনা করেন যে আমরা ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইয়াছি বলিয়াই এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, কেহ কেহ বলেন যে আমাদের পুর্ব্বপুরুষেরা কোন নিয়ম প্রতিপালন না করিয়াও স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া কালযাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আমরা

কেন নিয়মাধীন হইব? এরূপ তর্ক ভ্রম-সঙ্কুল বলিতে হইবে। অতি ভোজন, দুর্গন্ধময় বায়ু সেবন, অপরিষ্কৃত ও আর্দ্র গৃহে বাস, অতিশয় শীত বা রৌদ্রভোগ প্রভৃতি অন্যায়াচরণ করিলে, শরীরে কোন না কোন প্রকার অসুখ হইবেই হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড কখনই না হইবার নহে। সুস্থ ও দৃঢ়কায় ব্যক্তি যে মারিভয়াক্রান্ত স্থানে অল্পক্ষণ মাত্র অবস্থিতি করিয়া অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল নিয়ম পালন ও যেরূপ শারীরিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে কালাতিপাত করিতেন এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। অবস্থা-ভেদে ও দেশাচারের পরিবর্ত্তন-ক্রমে সকল বিষয়েরই প্রভেদ হইয়া যাইতেছে। অতএব যে যে নিয়ম পালন করিয়া চলিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় তাহা জানা সকলেরই কর্ত্তব্য। কয়েক খান প্রসিদ্ধ ইংরাজি * গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষোপযোগী কতক গুলি নিয়ম সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া এত-

---

Lardner's Animal Physiology

Quain's Anatomy

Mann's Manual of Physiology

Graham's Domestic Medicine

La Mert's "The Science of life."

Chambers' Preservation of Health &c &c.

দেশীয় ব্যক্তিদিগের কিছু উপকার হইলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

বর্ত্তমান কালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে রূপ অনিশ্চিত অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রায় কোন চিকিৎসকের হস্তেই শরীর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। অনেকেই অনুপযুক্ত ও অপরিমিত ঔষধ দিয়া নানা প্রকার নূতন রোগের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। এতদ্দেশে যে প্রাচীন চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়াছে, ডাক্তারদিগের মধ্যেও নানা প্রকার মতভেদ দেখা যাইতেছে। ঔষধ ব্যবস্থা করিবার সময় চিকিৎসকদিগের পরস্পরের অনৈক্য দেখা যায়। একে পীড়াই ক্লেশকর, তাহাতে আবার এরূপ চিকিৎসকদিগের হস্তে পতিত হওয়া আরও বিড়ম্বনার বিষয়। অতএব যাহাতে পীড়ার হস্তে পতিত হইতে না হয় তদ্বিষয়ে সকলকেই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

——০০——

স্বাস্থ্য রক্ষা।

প্রথম অধ্যায়

শারীর ক্রিয়া।

যে যে নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে। সেই সমুদায় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে শারীর ক্রিয়ার বিষয় কিছু লেখা আবশ্যক। সেই সকল ক্রিয়ার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

ক্ষুধা হইলেই আমরা আহার করিয়া থাকি। খাদ্য দ্রব্য হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়, ও সেই রক্ত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া শরীর রক্ষা করে। কিন্তু ক্ষুধার কারণ কি, ও আহার করিলেই বা কিরূপে তাহার শান্তি হয়, তাহা জানা কর্ত্তব্য। যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া না হইলে ক্ষণ মধ্যেই জীবন নাশ হয়, এবং যে পরিশ্রম, আমাদের সমস্ত সুখের একমাত্র সাধন, সেই দুইটী কার্য্য দ্বারাই ক্ষণে ক্ষণে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই ক্ষতিপূরণ করিবার প্রয়োজন হইলেই ক্ষুধার উদয় হয়,

তখন আমরা আহার করিয়া থাকি। ভুক্ত দ্রব্য, শরীরের অভ্যন্তরে গিয়া তত্রস্থ যন্ত্র সকলের দ্বারা রক্ত রূপে পরিণত হইয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানে সঞ্চারিত হয়, এবং ক্ষয় প্রাপ্ত অংশের পূরণ করিয়া দেয়। শরীরের যে অংশ অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ক্ষয় হইতে না হইতেই আবার তৎপ্রদেশে অধিক রক্ত যাইয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার পূরণ করে।

শরীর,—অস্থি, মাংস, ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে সমুদায়ই রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব শরীরের অন্যান্য অংশ যে কয়েক প্রকার ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত, রক্তে সে সকলেরই সত্তা আবশ্যক। বাস্তবিক * ও তাহাই আছে। সেই নিমিত্তই রক্তদ্বারা শরীরের ক্ষতি পূরণ হইয়া

* রাসায়নিক শাস্ত্রের সাহায্যে, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক রক্তে, যে উপাদান যে পরিমাণে আছে, তাহা অবধারিত হইয়াছে। তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

	মাংস	রক্ত
অঙ্গার	৫১.৮৩	৫১.৯৬
উদজান	৭.৫৮	৭.২৫
যবক্ষারজান	১৫.০৩	১৫.০৭
অম্লজান	২১.৩১	২১.৩০
অন্যান্য পদার্থ	৪.২৩	৪.২৩
	১০০.০১	১০০.০০

থাকে। রক্ত স্বীয় অংশ দ্বারা দেহের ক্ষতিপূরণ করিয়া স্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ভুক্ত দ্রব্য হইতে আবার রক্তের সেই ক্ষতি পূর্ণ হইয়া থাকে। আহার গ্রহণ না করিলে অল্প ক্ষণের মধ্যে রক্তের পুষ্টিকর অংশ দেহের ক্ষয়-নিবারণে নিঃশেষ হইয়া পড়ে, সুতরাং শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকে, সে সময় পুষ্টিকর অন্নদ্বারা রক্তের পোষণ করিতে না পারিলে অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

যে আহার দ্রব্য দ্বারা রক্তের দেহ-পুষ্টিকারিতা শক্তি জন্মে, যে যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার পরিপাক হয় তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

আমরা মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করি। দুগ্ধাদি কয়েক প্রকার দ্রব্য এককালে গলাধঃকরণ হয়, অন্যান্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে হয়। চর্ব্বণ কালে দন্তদ্বারা পিষ্ট ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া গল-নালী দ্বারা অন্ন-নালী নামক পথে গমন করে। পরে উদরের কিঞ্চিৎ বাম-ভাগে থলির ন্যায় স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানকে আমাশয় কহে। আমাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য উপস্থিত হইবা-মাত্র, তথা হইতে এক প্রকার প্রবল অম্লরস উৎপন্ন হইয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতেই পরি-পাক হইতে থাকে। এই রসকে আমাশয়িক রস কহে।

পরে উক্ত দ্রব্য এক নলাকৃতি সুদীর্ঘ * নাড়ীতে প্রবেশ করে। ঐ নাড়ীর নাম ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পক্বাশয়। ঐ নাড়ীতে থাকিতে থাকিতে যন্ত্র বিশেষ হইতে নিঃসৃত আরও তিন প্রকার রসের সহিত মিলিত হইলেই পাক-ক্রিয়া সমাধা হয়। আমাদের উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ নামক এক যন্ত্র আছে, তাহা হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকে পিত্তরস কহে। উদরের বামদিগে আমা-শয়ের নিম্নে আড় ভাবে অবস্থিত যে মাংস পিণ্ড আছে, তাহা হইতেও এক প্রকার রস নির্গত হয়। এই দুই প্রকার রস, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী দিয়া পক্বাশয়ের এক স্থানেই উপস্থিত হয়। আর এক প্রকার রস পক্বাশয়ের গাত্র হইতেই নির্গত হয়। এই তিন প্রকার রস, আমা-শয়িক রস ও লালা, ইহার মধ্যে একটীর অভাব বা অল্পতা হইলেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

যে পাঁচ প্রকার পাচক রসের উল্লেখ করা গেল, তাহাদের শক্তি একরূপ নহে। খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে রসবিশেষের কার্য্যকারিতা দেখা যায়। তৈলাদি পদার্থ ও মাংস পরিপাক করিতে লালার সহায়তা আবশ্যক করে না, আবার চাল, গম প্রভৃতি

* ইহা দীর্ঘে প্রায় ২০ ফীট হইবে। ইহার ব্যাস ১ ইঞ্চ হইতে ১৫ ইঞ্চ।

লালাযুক্ত না হইলে কোন মতেই পরিপাক পায় না। মাংসাদি কতকগুলি দ্রব্য আমাশয়িক রসে জীর্ণ হয়।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পাইলে তাহার সমুদায় সারাংশ আমাশয় ও পক্বাশয় সংলগ্ন অসঙ্খ্য নাড়ী দ্বারা রক্তে নীত হইয়া তাহার পুষ্টিকারিতা সম্পাদন করে।

পক্বাশয়ে পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহ হইবা মাত্র খাদ্যের সারভাগ দেহ পোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তখন অসার ভাগ প্রণালীবিশেষ দ্বারা মল রূপে নির্গত হইয়া পড়ে।

কিরূপে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক পাইয়া রক্তে পরিণত হয় তাহা বর্ণিত হইল। এক্ষণে রক্ত কিরূপে শরীরের সর্ব্বস্থানে চালিত হইয়া প্রয়োজন মতে ব্যয়িত হয়, তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক। এই ক্রিয়ার নাম রক্ত-সঞ্চালন।

আমাদের বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে বামপার্শ্বে একটী শূন্য-গর্ভ মাংস থলি আছে। তাহাকে হৃদয় বা রক্তাধার বলে। তাহা রক্ত পূর্ণ থাকে। নাড়ী বিশেষ দ্বারা তথা হইতে দেহের সর্ব্ব স্থানে রক্ত চালিত হয়। হৃদয় হইতে চালিত রক্ত, প্রথমতঃ একটী স্থূল রক্তবাহী নাড়ীতে প্রেরিত হয়, ঐ নাড়ী বক্রভাবে হৃদয়ের বাম পার্শ্বের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে গমন করিয়া, পরে নিম্নাভিমুখ হইয়াছে। ইহার নানা শাখা মস্তক, বাহু, পদদ্বয় প্রভৃতি

শরীরের সমুদায় অঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। এই শাখা-গুলিকে ধমনী কহে। ঐ সকল শাখা হইতে আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখা বাহির হইয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই গুলি এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য বিনা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা কেশ অপেক্ষায় সূক্ষ্ম, এজন্য ইহাদিগকে কৈশিকা কহা যায়।

যে সকল নাড়ীর উল্লেখ করা গেল ইহাদের দ্বারা চালিত রক্ত সর্ব্বশরীরে গমন করিয়া দেহের পোষণকার্য্য নির্ব্বাহ করে। শরীরের যেখানে যে কিছু ক্ষয় হইয়াছে তাহার পূরণ ও যেখানে যাহার বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন, তাহা বর্দ্ধিত করে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিকাপথে শরীরের সকল স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে, রক্তের পুষ্টিকর পদার্থ সকল ব্যয়িত হইযা যায়, ও নানা অঙ্গ হইতে স্খলিত দূষিত পদার্থ সকল ইহাতে মিশ্রিত হইতে থাকে। এই রূপে ইহার উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ কৃষ্ণ হয়। তখন ইহা আর এক প্রকার নাড়ী সমূহে নীত হয়। ইহাদিগকে শিরা কহে। কৈশিকা সমূহের সহিত শিরা সকলের যোগ থাকাতেই তাহাতে রক্ত গমন করে।

শিরা সকল প্রথমতঃ নানা শাখায় বিভক্ত থাকিয়া, কৈশিকা হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া, পরে দুইটী স্থূল প্রধান শিরায় মিলিত হইয়াছে। শিরাপথে ধাবিত রক্ত

এই দুই প্রধান শিরা দ্বারা অবশেষে হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হয়। হৃদয়ে উপস্থিত হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হয়।

শিরাপথে যে রক্ত হৃদয়ে আনীত হয়, তাহাতে কয়েক প্রকার দূষিত পদার্থ থাকে। সেই সকল পদার্থ দূরীকৃত না হইলে রক্তের পোষণীশক্তি জন্মে না, প্রত্যুত তাহা শরীরে চালিত হইলে বিষ তুল্য অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত দূষিত রক্ত বিশোধনের উপায়ও আছে। উহা হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অসঙ্খ্য নাড়ী দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ নামক যন্ত্রে যাইয়া বিশোধিত হয়। ফুস্‌ফুস্‌, বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে অবস্থিত; আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহা ফুস্‌ফুসে যাইয়া রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অতি আশ্চর্য্য রাসায়নিক কার্য্য উদ্ভাবন করে। উক্ত* কার্য্য দ্বারা পুনর্ব্বার রক্তে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ উৎপন্ন হয়।

* শরীরে অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান, ও অঙ্গার এই কয়েক প্রকার ভৌতিক পদার্থ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ধমনী প্রবাহিত লোহিত বর্ণ পুষ্টিকর রক্তে, অম্লজান বাষ্পের ভাগ অধিক, ও শিরাস্থ দূষিত রক্তে শরীরের স্খলিত উদজান, অঙ্গার, ও যবক্ষার মিশ্রিত পদার্থ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অম্লজান বাষ্প ও অঙ্গার যোগে, যে দ্রাম্ল অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়, ও যবক্ষার জান ও উদজান যোগে যে, "আমোনিয়া" বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা শিরাস্থ রক্তে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন উদজান ও অম্লজান যোগে উক্ত পর, জলীয় বাষ্পও পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে "আমোনিয়া" ব্যতীত আর সকলেই ফুস্‌ফুস্‌ হইতে প্রশ্বাসদ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া যায়। "আমোনিয়া" মূত্রদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে।

তৎপরে সেই বিশোধিত রক্ত, স্বতন্ত্র নাড়ী পরম্পরা দ্বারা হৃদয়ের বাম পার্শ্বে নীত হয়, ও তথা হইতে শরীরের পোষণকার্য্যে নিয়োজিত হইতে থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, হৃদয়দ্বারা তিনটী প্রধান কার্য্য সাধন হয়। প্রথমতঃ ধমনী-পথে সর্ব্ব শরীরে পুষ্টিকর রক্ত-চালন, দ্বিতীয়তঃ, সেই রক্তের পুনরাহরণ, তৃতীয়তঃ সেই পুনরাহরিত রক্তের বিশোধন, এই তিনটী ক্রিয়া দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হয়।

অন্নপরিপাক, এবং রক্তের সঞ্চালন ও বিশোধন ক্রিয়াদি সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে যে যে যন্ত্র বিশেষ দ্বারা অঙ্গ চালনা হয়, তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পেশী নামক যন্ত্র বিশেষ দ্বারা অঙ্গ-সঞ্চালন সম্পাদিত হয়। এক এক পেশী নানা সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সূত্রের সমষ্টি। আমরা পশু-শরীরের যে অংশ মাংস বলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি সে সকল পেশী মাত্র। পেশী সকল আবশ্যকমত সঙ্কুচিত হইতে পারে। ঐ রূপ সঙ্কুচিত

আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহাতে প্রধানতঃ ৭৯ ভাগ যবক্ষার জান ও ২১ ভাগ অম্লজান বাষ্প থাকে। অম্লজান বাষ্পের সংযোগে রক্তস্থ উদজান ও অঙ্গার, জলীয় বাষ্প ও দ্রাম্ল অঙ্গারক বাষ্প রূপে পরিণত হয়। অম্লজান বাষ্পযোগে যখন যে রাসায়নিক কার্য্য হয় তাহাতে তাপ নির্গমন হয়। তাহাতেই আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে যবক্ষার জান ও অম্লজান ব্যতীত, অন্যান্য বাষ্পও অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া [illegible]

হওয়াতেই অঙ্গ-চালনা হয়। হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানের পেশী আমাদের ইচ্ছানুসারে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এজন্য তাহাদিগকে ইচ্ছানুগ পেশী কহে। অন্য কতকগুলি পেশী আছে, তাহারা কখনই আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে, তাহাদিগকে ঈশ্বরপেশী বলে। আমাদের হৃদয় ও পাকযন্ত্রের পেশী সকল এই রূপ।

আমাদের শরীরে স্নায়ু নামক যন্ত্র আছে। পেশী সকল তাহাদের অধীন হইয়া কার্য্য করে। স্নায়ু সকল, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড হইতে বহির্গত এবং নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহাদের কার্য্য অতি বিস্ময়জনক। ইহারা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার কার্য্যেরই সাধক। আমাদের মনে যে কোন চিন্তার উদয় হউক না কেন, তৎসমুদায়ই স্নায়ুমূল-মস্তিষ্ক দ্বারা সাধিত হয়। আমরা স্নায়ু দ্বারাই বাহ্যবস্তুর পরিচয় পাই, এবং কোন অঙ্গপরিচালন করিবার ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছা স্নায়ু দ্বারাই উক্ত অঙ্গের পেশীতে সম্বেদিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করে; তাহাতেই অঙ্গ-চালনা হইয়া থাকে। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়, পাকযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্যও স্নায়ু সকলের উপর নির্ভর করে তাহার সন্দেহ নাই। দর্শন ও শ্রবণজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞানই স্নায়ু দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

[খ]

যে সকল যন্ত্রের কার্য্য উল্লেখ করা গেল, তদ্ব্যতীত আরও একটী কার্য্য দ্বারা আমাদের শরীর রক্ষা হয়। আমাদের ত্বক দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন হয়। যেমন ফুস্‌ফুসের কার্য্য দ্বারা, শরীরের দূষিত পদার্থ সকল অনবরতই বাহির হইয়া যায়, ত্বক দ্বারাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই কার্য্য সম্পান্ন হয়। ত্বক দ্বারা স্বেদ নির্গত হয়, তাহাতে জলীয় পদার্থ ও নানা প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে; তাহাতেই ঘর্ম্মে এত দুর্গন্ধ হয়। চর্ম্মের অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা যেমন স্বেদ বাহির হয়, তেমনই আবার তদ্দ্বারা বায়ু ও জল প্রবেশ করিয়া রক্তের শীতলতা সম্পাদন করে।

২ য় অধ্যায়।

খাদ্য।

সংসারে যত প্রকার রোগ আছে, তাহার অধিকাংশই অতিভোজন বা অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষে জ্বর, শূল, আমাশয়, যকৃৎদোষ, মস্তিষ্কের পীড়া, কাশ, শ্বাস প্রভৃতি রোগ হইয়া কত লোকের অশেষ ক্লেশ ও অকাল মৃত্যু হইতেছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। অতএব কিরূপ

নিয়মে আহার করা উচিত তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহার সারভাগ রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীরের পোষণ করে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, যে সকল পদার্থ দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, সেই সকল পদার্থই আমাদের খাদ্য। চাল ডাল, গম, তেল, মাচ, মাংস, আলু, দুধ, চিনি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আমরা সচরাচর আহার করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ের পুষ্টিকারিতাগুণ থাকাতেই তাহারা উৎকৃষ্ট খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, খাদ্য ত্রিবিধ শক্তিবিশিষ্ট না হইলে তদ্দ্বারা শরীর-পোষণ হয় না। ১ গ্লুটেন, ২ তৈল, ৩ শর্করা বা ষ্টার্চ, এই তিন পদার্থ যে যে দ্রব্যে আবশ্যকমত পাওয়া যায়, সেই সকলই আমাদের খাদ্য। গম চাল প্রভৃতি দ্রব্যের শুভ্রাংশকে ষ্টার্চ কহে। পিঙ্গলবর্ণ অংশের নাম গ্লুটেন। গ্লুটেন ও ষ্টার্চ, অল্প বা অধিক পরিমাণে অনেক পদার্থে পাওয়া যায়। মাংসে গ্লুটেন অধিক ও শস্যাদিতে ষ্টার্চ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

গ্লুটেন দ্বারা শরীরের অস্থি, পেশী প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ হয়, ও তৈল শর্করা, বা ষ্টার্চ, নিশ্বসিত অম্লজান

বাষ্পযোগে দগ্ধ হইয়া শরীরে তাপ উদ্ভাবন করে, ও পরিশেষে জলীয় বাষ্প ও দ্রাম্ল অঙ্গারক বায়ুরূপে পরিণত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। তৈল, শর্করা, ও ষ্টার্চ এক জাতীয় পদার্থ। ইহারা সকলে তৈলরূপে পরিণত হইয়া দগ্ধ হইয়া থাকে। এবং ইহাদের কিয়দংশ দ্বারা শরীরে মেদ সঞ্চয় হয়।

যে ত্রিবিধ পদার্থের কথা লেখা হইল তাহার কোনটীর অভাব হইলে শরীররক্ষা হয় না। যদি গম বা চালের গ্লুটেন বা ষ্টার্চ বাহির করিয়া লইয়া, কোন ব্যক্তিকে শুদ্ধ তাহার অবশিষ্ট ভাগ রন্ধন করিয়া খাওয়ান যায়, তাহা হইলে তাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে ও পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোন দ্রব্য নাই শুদ্ধ যাহার উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শরীর-ধারণ করা যায়। দুগ্ধের অতি আশ্চর্য্য শক্তি। ইহাতে তিন প্রকার পদার্থই প্রয়োজনমতে মিশ্রিত থাকাতে মাতৃ স্তন্য-পান করিয়া শিশুগণ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শস্যাদির মধ্যে গম প্রধান। শুদ্ধ গম আহার করিয়া অনেক দিন বাচিয়া থাকা যায়, এই নিমিত্ত ইহা অনেক দেশে ব্যবহৃত। ইহাতে তৈলের ভাগ না থাকাতে আমরা ঘৃত সংযোগ করিয়া রুটী বা লুচী প্রস্তুত করিয়া থাকি।

আমাদের দেশে অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিয়া

বৎসর বৎসর কত লোকের মৃত্যু হইতেছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। যে ত্রিবিধ পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, হয়ত তাহার মধ্যে ষ্টার্চ ভিন্ন আর কোন পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে না পাইয়া অনেক দুঃখী লোক নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়ে, ও ক্রমে ক্রমে অনাহার মৃত্যুর সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু তাহারা পুষ্টিকর আহার পাইলে অল্পদিনের মধ্যে সবল ও সুস্থ হইয়া উঠে। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকে দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্যাদি আবশ্যকমত না খাইয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন। আহার বিষয়ে স্ত্রীজাতির যে স্বাভাবিক লজ্জা আছে, তাহার বশীভুত হইয়া তাঁহারা সন্তানগণকে ও পুরুষ-বর্গকে সমুদায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য অর্পণ করিয়া আপনারা অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া কতই ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে পীড়া হইতে মুক্ত হইয়া, পরে পুষ্টিকর আহারাভাবে দীর্ঘ কাল দুর্ব্বল থাকেন ও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হন।

দেহ ভ্রমণ করিতে করিতে রক্তের পুষ্টিকর পদার্থ শরীরের কার্য্যে বিনিয়োজিত হইয়া গেলে, নুতন পদা-র্থের আবশ্যক হওয়াতে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া আমাদি-গকে আহার-গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করে। আপাততঃ বোধ-হয় যেন পাকযন্ত্রই ক্ষুধার স্থান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা

নহে। ইহা সর্ব্ব শরীর-ব্যাপী। যদি আহার-গ্রহণ করিবামাত্র ক্ষুধাজনিত ক্লেশ এককালে দূর হইত, তাহা হইলে পাকযন্ত্রই ক্ষুধার স্থান বলিয়া বিশ্বাস হইত। উপবাসের পর আহার করিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদৌর্ব্বল্য যায় না, যে পর্য্যন্ত ভুক্ত অন্নের কিয়দংশ পরিপাক হইয়া রক্তে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ কোনমতেই শরীর সুস্থ হয় না।

কি পরিমাণে আহার করিলে শরীর সবল থাকে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে অভ্যাসই প্রধান; কোন ব্যক্তি অধিক খাইয়াও অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন; অন্য কেহ তৎপরিমাণে খাইলে তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইয়া পড়েন। কিন্তু সচরাচর অতি ভোজন করিয়া অনেকেই ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে পর্য্যন্ত উদর স্ফীত হইয়া না উঠে, ততক্ষণ আহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ বিবেচনা মূর্খতাবশতঃই হইয়া থাকে। যাহা হউক, ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে, ক্ষুধা-শান্তি হইল কি না তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি করিয়া খাইলে অল্প সময়ে অধিক অন্ন উদরস্থ হয় বটে; কিন্তু তাহা হইলেই যে শীঘ্র শীঘ্র শরীর পোষণ হয় এরূপ নহে। এদেশের স্ত্রীদিগের অজ্ঞতা দোষে অতি ভোজনের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। অধিক আহার দিলে

শিশু সন্তানেরা শীঘ্র শীঘ্র সবল হইবে ভাবিয়া তাঁহারা কত অনিষ্ট করিয়া থাকেন। সকল শিশুই প্রায় উদরাময় প্রভৃতি ক্লেশকর রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে, ও অনেকে অল্প বয়সে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া অবোধজননী-দিগকে চিরদুঃখিনী করিয়া যায়। কিন্তু মূর্খতা কি সুখের বিষয়, প্রকৃত কারণ না জানাতে তজ্জন্য তাঁহারা কোন অনুতাপই অনুভব করেন না। শৈশবাবস্থায় অতি ভোজন অভ্যাস হইলে আমাদের স্থিতিস্থাপক পাকস্থলির আয়তন বৃদ্ধি হওয়াতে, প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার না করিলে আর তৃপ্তি বোধ হয় না; সুতরাং যত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই অপরিমিত আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া যায়। যাহারা মাতৃ ক্রোড়ে এরূপ দোষাকর ব্যবহারে দীক্ষিত হয় তাহাদের বাঁচিবার উপায় কি?

অতিভোজনজনিত রোগের উপবাসই একমাত্র ঔষধ। উপবাস করিলে বা আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিলেই রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই সহজ উপায় অবলম্বন না করিয়া অনেকে নানা-প্রকার ঔষধ খাইয়া থাকেন; কিন্তু রোগের প্রকৃত কারণ উপস্থিত থাকাতে তাহাতে তাদৃশ উপকার হয় না। এরূপ অবস্থায় ঔষধ-সেবন কেবল অতি ভোজনের সহা-য়তাই করিয়া থাকে। কেহ কেহ অতি ভোজনের

অনুরোধে সুরা, সিদ্ধি প্রভৃতি মাদকদ্রব্য খাইয়া কত অনিষ্টপাত করিয়া থাকেন, তাহা বলা যায় না।

আমরা যথেচ্ছাচারী হইয়া আহার করিলে অপকার হইবে, তাহার বিশিষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে। যে কয়েকটী শারীরিক রসের সহিত মিলিত হইয়া অন্ন পরিপাক হইয়া থাকে, সেই সকল রস প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, সুস্থ শরীরে প্রত্যহ প্রায় এক পাইন্ট লালা ও ৩ পাইন্ট আমাশয়িক রস নির্গত হয়; ইহাতে যে পরিমাণের দ্রব্য পরিপাক করা যাইতে পারে, তাহার অধিক হইলে ভুক্ত দ্রব্য দীর্ঘ কাল উদরে থাকিয়া পাকযন্ত্র প্রপীড়িত করে বা উদরাময় বমন প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া দেয়। দেখা গিয়াছে, পীড়া কালে আহার করিলে তাহা কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ভাবে উদরে অবস্থিতি করে। এজন্য পীড়াকালে আহার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

আমাদের শরীরের যে অঙ্গ যত চালনা করা যায়, তাহা তত শীঘ্র ক্ষয় হইয়া থাকে, এই ক্ষতিপূরণ জন্য দেহস্থ রক্ত তদভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হয়। আহার করিবামাত্র পাক-স্থলির কার্য্যারম্ভ হইয়া তত্রস্থ পেশী সমূহ দুর্ব্বল হইতে পারে। তখন তাহাদিগকে সামর্থ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎপ্রদেশে রক্তের

প্রবল গতি হয়। কোনমতে এই গতির ব্যাঘাত হইলে পরিপাক কার্য্যেরও ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অতএব আহারকালে বা তাহার অব্যবহিত পরে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিলে অঙ্গ বিশেষে বা মস্তিষ্কে রক্তের অধিক আবশ্যক হওয়াতে, তাহা পাকযন্ত্রে গমন করিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে পরিপাক কার্য্য ও সুন্দররূপে হয় না। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিশ্রম করিলে রক্ত যে সকল অঙ্গের ক্ষতিপূরণে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইতে সহসা পাক-যন্ত্রে ফিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং পূর্ব্বমত অনিষ্ট হয়*। অতএব আহার করিবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে ও আহার কালে, কোন পরিশ্রম না করিয়া কেবল আমোদ প্রমোদ করা কর্ত্তব্য। মন প্রফুল্ল থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে শারীরিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হইতে থাকে।

খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের উপযুক্ত করিবার জন্য আমরা রন্ধন করিয়া থাকি। কাঁচা চাল সহজে পরিপাক হয় না, কিন্তু ভাত অনায়াসে পরিপাক করা যায়। রন্ধন

---

* এই যুক্তি অনুসারে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে স্নান করাও অন্যায়। স্নান ও গাত্র মার্জ্জনা করিলে রক্তের গতি ত্বগভিমুখে হয়। সেই রক্ত পাকস্থলিতে প্রত্যাবর্ত্ত হইলে স্নানজনিত সুখাস্বাদন হয় না, প্রত্যাবর্ত্ত না হইলে ভাল পরিপাক হইতে পারে না।

দ্বারা খাদ্য-দ্রব্যের ষ্টার্চ শর্করাসদৃশ হইয়া উঠে, গ্লুটেন কোমল হয় ও তৈল জমাট হইয়া যায়। পক্ব আম্র প্রভৃতি কয়েকটী ফল রন্ধন না করিয়াও খাওয়া যায়, কারণ তাহারা পূর্ব্বেই সূর্য্য-পক্ব হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমতঃ রন্ধন ও পরে দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকি। পেষণ করিবার সময় অন্নের সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া তাহার অনেক রূপান্তর করিয়া থাকে। ষ্টার্চ বিশিষ্ট দ্রব্য সকল লালা সংযোগে শর্করার ন্যায় হইয়া থাকে, তাহা স্বাদ দ্বারাই অনুভব করা যায়। অতএব রন্ধনকালে অন্ন যাহাতে অপক্ক না থাকে, ও চর্ব্বন সময়ে যাহাতে সুন্দর রূপে পিষ্ট ও লালা মিশ্রিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে এবিষয়ে গুরুতর অপরাধী বলিতে হইবে।

পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যই রন্ধনের একমাত্র উ-দ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে এত কারীগিরী উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। রন্ধন সময়ে এলাচি, মরিচ, শরিষা, দারুচিনি, পলাণ্ডু প্রভৃতি নানা মসলা অধিক পরিমাণে খাদ্যে সংযুক্ত হইয়া তাহার গুণের এত প্রভেদ করিয়া ফেলে যে, আর সহজে পরি-

পাক করা যায় না। অধিক পরিমাণে খাইলে পিপাসা উপস্থিত হয় ও পাক-যন্ত্রের অভ্যন্তর প্রপীড়িত হইয়া নানা রোগের উদয় হইয়া থাকে। পলান্ন প্রভৃতি ঘৃত মসলা যুক্ত দ্রব্য এতদ্দেশে অধিক পরিমাণে সহ্য হইবার নহে। যাহারা স্থূলকায় ও দুর্ব্বল, অধিক মসলা খাইলে তাহাদেরই কেবল অপকার হয় না। অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈল যুক্ত দ্রব্য ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি মেরু সন্নিহিত দেশে বিশেষ উপকারী। সেখানে ইহা দ্বারা যেমন সহজে শারীরিক তাপ রক্ষা ও শীত নিবারণ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ভাত দ্বারাই এতদ্দে-শীয় লোকের শরীরের তাপ রক্ষা হইতে পারে। তেল বা চিনি অধিক খাইলে এদেশে গাত্র জ্বালা রোগ উপ-স্থিত হয়।

৪। আমরা মাংস ভোজন না করিয়া অনায়াসে দীর্ঘজীবী হইতে পারি। যে সকল দ্রব্য আমাদের খাদ্য, তৎসমু-দায়ে প্রয়োজনীয় গ্লুটেন ও ষ্টার্চ পাওয়া যায়, সুতরাং মাংস না খাইলে শরীর-রক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সময় বিশেষে মাংস খাওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। যখন রোগ দ্বারা শরীর শীর্ণ হয়, তৎকালে অল্প পরিমিত দ্রব্যে অধিক পুষ্টিকর পদার্থ আছে এরূপ খাদ্য মনোনীত করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ ও মাংস ভিন্ন আর কোন দ্রব্যের দ্বারা এই প্রয়োজন সাধন হয় না। উদরা-

মল বা অম্লের পীড়া থাকিলে দুগ্ধে অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নহে, এরূপ স্থলে মাংসই এক মাত্র অবলম্বন। কিন্তু আমাদের দেশে যে কুৎসিৎ প্রণালীতে মাংস রন্ধন করা হয়, তাহাতে পীড়িত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, সহজ শরীরেও পরিপাক করা কঠিন হয়। শল্য বা সিদ্ধ মাংসই রোগীর পথ্য; মসলা ও ঘৃতযুক্ত হইলেই গুরুপাক হয়।

আমাদের দেশে, মাংস ভোজনের বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু শীতপ্রধানদেশে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। মনুষ্যের অসভ্যাবস্থায় পশু-মাংসই প্রধান জীবনোপায়। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে অন্যান্য দ্রব্য করতলস্থ হয়, তখন মাংসের ব্যবহার কমিয়া আসে।

যাহারা অনুক্ষণ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করেন মাংস তাহাদের পক্ষে মহোপকারী। ইহাদ্বারা যত শীঘ্র দেহের ক্ষতি-পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় তত আর কিছুতেই হয় না। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না বলিয়াই শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহাদিগকে মাংস খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এরূপ অনুভব হয়।

অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য খাইতে গেলে আর একটী দোষ হইয়া থাকে। মসলার অনুরোধে অনেকে অপরিমিত ভোজন করিয়া বসেন। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়।

অম্ল, আচার, আত্রসত্ত্ব প্রভৃতি দ্রব্যেরও এই রূপ দোষ দেখা যায়।

কিন্তু অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য খাওয়া অবৈধ বলিয়া, স্বাদগন্ধ-শূন্য মৃত্তিকাবৎ দ্রব্য আহার করাও অন্যায়। যাহা খাইতে অনিচ্ছা হয় তাহা পরিপাক করা কঠিন হয়।

প্রত্যহ এক দ্রব্য খাইলে আহারে অরুচি হয়, এবং শরীরে যে সকল পদার্থের প্রয়োজন তাহাও পাওয়া যায় না, এজন্য মধ্যে মধ্যে খাদ্য পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা তিথি বিশেষে যে যে দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বোধ করি তাহার উদ্দেশ্যই এই।

খাদ্য দ্রব্য নিতান্ত শীতল বা উষ্ণ হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, ও তাহাতে পাকযন্ত্র সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পরিপাক কার্য্য সংপূর্ণ হইতে অন্ততঃ ৪ঘণ্টা কালের প্রয়োজন। কিন্তু কেহ কেহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর কিছু কিছু আহার করিয়া থাকেন। উক্ত রূপ করাতে পাক-যন্ত্র সকল বিশ্রামাভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরি-পাকান্তে ২ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম পাইলেই পাকযন্ত্র সকল পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে। অতএব একবার আহার করিলে অন্ততঃ তাহার ৬ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয়বার আহার

করা উচিত। প্রাতঃকালে ১০ টার সময় খাইলে বৈ-কালে ৪ টার সময়, ও রাত্রিকালে ১০ টার সময় খাওয়া উচিত। নিদ্রাকালে পরিপাক হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। এজন্য পর দিন ১০টা পর্য্যন্ত অনাহারী থাকিলে ক্লেশ হয় না। দিবসে আহারান্তে নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে অজীর্ণ দোষ হয়। এরূপ হইলে যে পর্য্যন্ত সুন্দর রূপ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবত কাল অনাহারী থাকা উচিত।

চাল, ডাল, দুধ, মাচ, মাংস প্রভৃতি আহার করিতে পাইলে, প্রত্যহ, শুষ্কদ্রব্য এক সেরের অধিক রন্ধন করিয়া খাইবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা দুর্ব্বল, ও যাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহারা অনেক কম পরিমাণে খাইলেই, তাহাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে। প্রত্যহ ৩ বারে দেড় পোয়া চালের ভাত, এক পোয়া ময়দার লুচী বা রুটী, দুই ছটাক ডাল, ও আদসের দুধ খাইলেই স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য থাকিতে পারে। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে, ডালের পরিবর্ত্তে এক পোয়া মাংস খাইলে চলিতে পারে। পরিশ্রম ও বয়স ভেদে আহারের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে।

কয়েক প্রকার ডাল, মাচ, ও তরকারী আমাদের দেশে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এসকল দ্রব্য

রন্ধন দ্বারা সুন্দররূপে সিদ্ধ না হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। অনেকে অপক্ক ডাল বা তরকারী খাইয়া কত রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল শরীরে ডা-লের ঝোল খাওয়া উচিত।

তরকারীর মধ্যে কয়েক প্রকার আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পটল, বার্ত্তাকু প্রভৃতির হরিদংশ কখনই পরিপাক হয় না, অতএব রন্ধন করিবার পূর্ব্বেই তাহা পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। আমরা যে সকল শাক ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে প্রায়ই সারাংশ নাই, এজন্য তৎসমুদায়ই পীড়াদায়ক। তিক্তরস বিশিষ্ট যে যে শাক খাইতে হয়, তাহার কাত খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শাকজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্দেশে অতি অল্প লোকেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সিম, লাউ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি রোগী ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ। যে যে তরকারীতে হরিদংশ ও জলীয় ভাগ অধিক, তাহা ব্যবহার করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

আমরা যে কয়েক প্রকার মৎস্য খাইয়া থাকি তন্মধ্যে রোহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে যে মৎস্যে তৈল বা জলের ভাগ অধিক তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। তৈল অধিক থাকিলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়, ও জলীয়ভাগ অধিক হইলে শরীরের উপকার হয় না। ক্ষুদ্র মৎস্য রোগীদিগের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। ইহাতে

তৈলের ভাগ অধিক না থাকাতে সহজে পরিপাক হয়। পচা মাচ রোগের মূলীভুত, ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ। মাচ, জল হইতে তুলিবার ১২ ঘন্টা পরে অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

আমরা অনেক দ্রব্য তৈল দিয়া ভাজিয়া খাই। যে দ্রব্য সিদ্ধ করিলে অনায়াসে পরিপাক করা যায়, ভাজিলে তাহা উগ্র হইয়া উঠে। অতএব দুর্ব্বল শরীরে ভাজা জিনিষ খাওয়া অবৈধ।

দধি, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্য সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে অপকার হয় না। লেবু, তেঁতুল প্রভৃতিতে বরং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে নানা রোগ উপস্থিত হয়। জ্বর বিশেষে লেবু মহোপকারী।

অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন করিলে পীড়া হয়। যাহাদের অজীর্ণ রোগ ও অম্লের পীড়া আছে, ইহা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সহজ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

ফলের মধ্যে বেল মহোপকারী। ইহা অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে খাওয়া উচিত। আম্র, রম্ভা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাইলে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সুস্থ শরীরে অল্প করিয়া খাইলে, ইহাতে উপকার ভিন্ন অপকার

নাই। সুস্থ শরীরে নারিকেল, পেঁপিয়া প্রভৃতিও উপকারী। কোমল নারিকেল সহজেই পরিপাক হয়।

দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত সর্ব্ব প্রধান, ইহা অনেক কার্য্যেই লাগিয়া থাকে। ছানা সহজে পরিপাক হয় না। সর ঘৃতের রূপান্তর মাত্র। ইহা অল্প পরিমাণে খাওয়াই উচিত। পীড়িতাবস্থায় এ সমুদায় নিষিদ্ধ। উত্তাপ দ্বারা ক্রমে শুষ্ক করিলে দুগ্ধ হইতে ক্ষীর উৎপন্ন হয়। ইহা অধিক খাইলে পীড়া হয়।

হংস প্রভৃতি কয়েকটী পক্ষীর ডিম্ব অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাজা বা সিদ্ধ করিতে নিতান্ত কঠিন হইলে, ইহা গুরুপাক হইয়া উঠে। কিন্তু ৫ মিনিট কাল মাত্র অত্যুষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে, অতি সহজে পরিপাক হয়।

এতদ্দেশীয় জলখাবারের মধ্যে মুড়ি ও ভাজা চিড়ে অতি লঘু। ইহা অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা সহজে পরিপাক হইতে পারে। দীর্ঘকাল রাখিলে বা জলসংযুক্ত হইলে ইহা অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। নারিকেল সহকারে খাইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। মুড়্‌কি প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য মুড়ির ন্যায় সহজে পরিপাক হয় না।

এতদ্দেশীয় পিষ্টকাদি প্রায়ই অনিষ্টকর। কিন্তু সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে বিশেষ পীড়াদায়ক হয় না।

অন্নমণ্ড, যবমণ্ড প্রভৃতি, দুর্ব্বল ও পীড়িত শরীরে বিশেষ উপকারী। অনেকে পীড়াকালে এ সকল খাইতে সঙ্কুচিত হইয়া, ভ্রমবশতঃ ডুমুর, পটল প্রভৃতি খাইয়া পাকস্থলিকে দূষিত করিয়া ফেলেন।

৩য় অধ্যায়।

পানীয়।

মনুষ্য শরীর যে যে উপাদানে নির্ম্মিত, তন্মধ্যে জলই প্রধান। যে রক্ত প্রবাহিত হইয়া শরীরের ক্ষতি পূরণ করে তাহার অনূ্যন ৪/৫ ভাগ বিশুদ্ধ জলমাত্র। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে আমাদের সমুদায় শরীরের ৩/৪ ভাগ বিশুদ্ধ জল মাত্র। শরীরে যে পরিমাণে জল থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, কোন কারণবশতঃ তাহার অল্পতা হইলেই আমাদের পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমরা জল পান করি। জল পান করিলে সেই পিপাসা নিবারণ হয়, তখন শারীরিক কার্য্য সকল অব্যাহতরূপে চলিতে থাকে। পীপাসা-কালে জল না পাইলে যে ভয়ানক ক্লেশ হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

ফলতঃ অনাহারে বরং কয়েক দিন জীবিত থাকা যায়, কিন্তু জলপান না করিলে অতি স্বরায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনশনে জীবন ত্যাগ করে, পিপাসাই তাহাদিগকে সমধিক যাতনা দেয়; এমন কি, তাহাদের তৎকালোক্ত কাতর-বচন শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্র হয়। এমত সময়ে তাহারা বৃষ্টির জলবিন্দু পাইয়াও অতৃপ্ত নয়নে জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাই পান করিয়া ও তাহাতে শয়ন করিয়া, কত তৃপ্তি অনুভব করে তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ অল্প পরিমাণে জল পাইয়াও কয়েক দিবস পর্য্যন্ত মৃত্যু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। বাস্তবিক জল যে জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা অপ্রাকৃত নহে।

আমাদের ত্বক্, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির কার্য্যদ্বারা নিয়তই শরীর হইতে জল বহির্গত হইতেছে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই সকল কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয়, সুতরাং গ্রীষ্মকালে অধিক জলপান করিতে হয়। আমরা স্নান করিলে ত্বকের অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা শরীরে জল প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে পিপাসা নিবারণ হয়।

আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, তৎসমুদায় পাকযন্ত্রে অবস্থিতি কালে দ্রবীভূত হইয়া শরীরে শোষিত হয়। শরীরে জলীয় পদার্থের অল্পতা হইলে অন্ন

দ্রবীভূত হইতে পারে না, সুতরাং পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। জল যেমন দ্রাবক এমন আর দেখা যায় না। অজীর্ণ দোষ হইলে উপযুক্ত পরিমাণে জলপান করিলে যে বিলক্ষণ উপকার হয় তাহার বিশেষ কারণ এই।

পিপাসা হইলেই জলপান করা উচিত। যে পরিমাণে পান করিলে পিপাসা শান্তি হয়, তাহার অধিক খাইলে পীড়া দায়ক হয়। কিন্তু অতিভোজন যেমন অনিষ্টকারী, অতিপান তত দোষাবহ নহে। অতিরিক্ত জলীয় ভাগ অতি শীঘ্রই ঘর্ম্মাদি দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া যায়; কিন্তু ঘর্ম্মাদির আতিশয্য বশতঃ ক্লেশ হইয়া থাকে।

ক্ষুধা সময়ে, যেমন ধীরে ধীরে আহার করিলে ক্ষুধা শান্তি হইল কি না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়, সেই রূপ পিপাসা হইলে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া জল খাইলে পিপাসা নাশ হইল কি না, অনায়াসে তাহার উপলব্ধি হয়। যেমন আহার করিবা মাত্র ক্ষুধাজনিত ক্লেশ যায় না, সেই রূপ জলপান করিবা মাত্র পিপাসাও অন্তর্হিত হয় না। যে পর্য্যন্ত পীতবারির কিয়দংশ শরীরের কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ পিপাসা-জনিত ক্লেশ অন্তর্হিত হইবার নহে।

যখন পরিশ্রম করিতে করিতে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়,

তৎকালে শীতল জলপান করা অবৈধ। ঘর্ম্ম-নিঃসরণ-কালে, ত্বগভিমুখে রক্তের গতি হয়। শীতল জলপান করিলে, সহসা সেই গতির ব্যাঘাত হয়, তাহাতে ত্বগভি-মুখে ধাবিত রক্ত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, হৃদয়, ফুস্‌ফুস বা পাকযন্ত্রে গমন করিয়া তাহাদের পীড়া উৎপাদন করে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ভুক্ত অন্ন, কয়েক প্রকার শারীরিক রসের সহিত সংমিলিত হইয়া জীর্ণ হয়। কোনরূপে এই সংমিলনের ব্যাঘাত হইলে, পরি-পাক কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে বা আহারকালে অধিক জল খাইলে, পাচক রস-সকল জল-সংযোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন তাহা-দের দ্বারা সুন্দররূপে পরিপাক হয় না। এজন্য তৎ-কালে অধিক জলপান করা নিষিদ্ধ।

কোন উষ্ণ দ্রব্য পান বা ভোজন করিবার অব্যাহিত পরে, শীতল জল খাইলেও অনিষ্ট হয়। উষ্ণ দ্রব্য খাইলে, সমুদায় শারীরিক কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে, ঘর্ম্মাদি নিঃসরণও হয়, এরূপ সময়ে শীতল জলপান করিলে ত্বক্ বা পাকযন্ত্রাভিমুখে ধাবিত রক্ত, সহসা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র বিশেষে গমন

করিয়া, পীড়া দায়ক হইতে পাবে। এই নিয়ম না বুঝিয়া অনেকেই কফ, কাশ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

যে জল আমাদের শরীর রক্ষার একটী প্রধান সাধন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না। অনেক স্থানেব লোকেই, পঙ্কিল, তৃণলতা-পূর্ণ, বৃক্ষাচ্ছাদিত, পূতি গন্ধ-বিশিষ্ট পুষ্করিণীব জলপান কবিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। কোন কোন গ্রামেব নিকটে নদী বা বীল আছে তাহাব জলও অপকৃষ্ট। এরূপ জলে, নানা প্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে তাহা পীড়াদায়ক হয। ইহা শোধন করিবারও সহজ উপায় আছে। প্রথমতঃ, ইহা সুন্দর রূপে উত্তপ্ত করিলে, তাপ-সংযোগে ইহার কয়েক প্রকার দূষিত বাষ্প বহিষ্কৃত হয়। তৎপরে সামান্য অঙ্গাব-চূর্ণ-পবিপূর্ণ কলসীতে ঢালিতে হয়। কলসীব তলায় একটী ছিদ্র রাখিয়া, তাহার নীচে একটী পাত্র স্থাপন করিলে প্রায নির্ম্মল জল পাওযা যাইতে পারে। ইহার দূষিত পদার্থ সকল অঙ্গার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গার দিয়া বিশোধন করিলে জলের স্বাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়া উঠে। অবশেষে ব্লটিং কাগজ বা মোটা কাপড়ের উপর ঢালিলে, ইহার অপরিষ্কৃত অংশ প্রায়ই তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। তখন সেই জল পান করিলে, আর পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

যে নদী বা পুষ্করিণীর তলা বালুকাময়, ও যাহাতে সর্ব্বদা বায়ু ও রৌদ্র লাগিয়া থাকে, এরূপ স্থানের জল প্রায়ই বিশুদ্ধ। কিন্তু স্নান ও গাত্র মার্জ্জনকালে তাহাতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ যোজিত হইয়া তাহাকে পীড়াদায়ক করিয়া ফেলে। যে নদীতে স্রোত আছে তাহার জলই উৎকৃষ্ট, কিন্তু বর্ষাকালে তাহাতে নানা পদার্থ মিশ্রিত হয়। তখন পূর্ব্বোপায়ে বিশোধন না করিলে তাহা পীড়াদায়ক হইতে পারে। কোন কোন নদী সমুদ্র-সন্নিহিত। তাহাদের জল ব্যবহার্য্য নহে।

এক্ষণে এদেশের অনেকে আর জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হন না। ইংরাজ জাতির সংসর্গ-দোষে তাঁহারা সুরাসক্ত হইতেছেন। যে সকল মহৎগুণে ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্টতর হইয়াছেন, যাহার প্রভাবে তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে মাননীয় হইয়াছেন, তৎ সমুদায়ের অনুকরণে অসমর্থ হইয়া অনেকে তাঁহাদের জঘণ্য সুরাসক্তিরই অনুচর হইতেছেন। সুরাপানে ইংলণ্ডে যে সকল মহানিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিযাও তাঁহারা ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হন না। সুরাসক্ত ব্যক্তিরা সকল প্রকার কুক্রিয়া করিতেই উদ্যত। যদি কেহ নরাকৃতি পশু দেখিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কলিকাতা নগরীর লালবাজার প্রভৃতি

স্থানে গমন করিয়া ইংরাজ গোরাদিগকে দেখিলেই পূর্ণ-মনস্কাম হইবেন। যে সকল কার্য্যে মনুষ্য নামের অবমাননা হয়, তৎসমুদায়ই সুরাসক্ত লোকের সাধ্য। অল্পকালের মধ্যেই এদেশের কত বিদ্যা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট উদার স্বভাব ব্যক্তি সুরাপান করিয়া কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, ও কত জন কত গর্হিত ক্রিয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে সুস্থ শরীরে সুরা বিষতুল্য। ইহা পান করিলে, নানা প্রকার অচিকিৎস্য রোগ উপস্থিত হয়। উদরাময়, যকৃৎ রোগ শ্বাস, কাশ প্রভৃতি ভয়ানক রোগ-পরম্পরা অতি অল্প কালের মধ্যেই দেখা দেয়, ও পরিশেষে প্রবল হইয়া জীবন হরণ করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে এই সকল ফল কিছু বিলম্বে হয়; কিন্তু এতদ্দেশে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠে।

তৈলাদি পদার্থের ন্যায়, সুরা ও ফুস্ফুসে গমন করিয়া দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে তাপ উদ্ভাবন হইয়া শরীর উত্তপ্ত হয়। ইহার দাহনকালে, রক্তস্থ দূষিত পদার্থ সকল, উচিত পরিমাণে সংশোধিত ও বহিষ্কৃত হইতে পারে না সুতরাং তাহা রক্তেই থাকিয়া যায়, সেই রক্ত দেহ-পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব্ব প্রথমে মস্তিষ্ক, পরে অন্যান্য যন্ত্রের বিকৃতি জন্মিয়া দেয়, তাহাতেই মাতালেরা বিবেক

শক্তি-বিহীন হইয়া পড়ে। তখন শীতক্রিয়া প্রভৃতি সন্তর্পণ করিলে, তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারে।

দীর্ঘকাল সুরাপান করিলে, মুখশ্রী অপকৃষ্ট হইয়া যায়, শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, চক্ষুদ্বয় সততই রক্তবর্ণ থাকে, নাসিকাগ্র লোহিত বর্ণ ও স্ফীত হয়, ও অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হয়। অন্ত্র, যকৃৎ প্রভৃতি পাকযন্ত্রের বিকৃতি জন্মে, তাহাতে নানা বলবৎ রোগ হয়। কোন কোন ব্যাক্তি সুরাপান করিয়া আসন্ন মৃত্যু মুখেও পতিত হন। দেহস্থ রক্ত, অতি প্রবলবেগে মস্তিষ্কে ধাবিত হইয়া, তত্রস্থ শিরা বা ধমণী বিশেষকে ছিন্ন করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ হরণ করে।

এদেশে সুরা ব্যতীত, আরও নানা প্রকার মাদক দ্রব্য প্রচলিত আছে, তম্মধ্যে সিদ্ধি. আফিং, গাঁজা ও চরস প্রধান। এই কয়েকটীর যোগে নানা প্রকার মাদক প্রস্তুত হয়। এ সমুদায়ই অনিস্টকারী; ইহাদের বশীভুত হইলে নানা রোগ ও অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে।

পীড়া হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সকল প্রকার মাদক দ্রবাই গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মাদকপ্রিয়, যে অনেক পীড়াতেই অবৈধ পরিমাণে তাহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এরূপ লোকের কথায় বিশ্বাস করা কোন-

মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কত ব্যক্তি পীড়াকালে মাদক সেবন আরম্ভ করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে ভযানক মাদকাসক্ত হইয়াছেন, ও পরিশেষে নানাবিধ পাপপঙ্কে পতিত হইয়া ইহলোক হইতে অকালে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। অতএব পীড়া কালেই বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যাহারা মাদক সেবনে একান্ত রত, তাহারা প্রথমতঃ পীড়ার অনুরোধেই এরূপ বিষভক্ষণ অভ্যাস করিয়াছেন। পরে জীবন পরিত্যাগও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন, তথাপি মাদক ত্যাগ করিতে পারেন না।

৪র্থ অধ্যায়।

বায়ু।

খাদ্য বা পানীয় অভাবে কযেক দিবস জীবন ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বায়ু-রোধ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হয়। যাহারা জলমগ্ন হয় বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, বায়ুর অভাবেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। কখন কখন বায়ুর পরিবর্ত্তে, অন্য কোন কোন বাষ্প গ্রহণ করিলেও মৃত্যু হইয়া থাকে। যে অঙ্গার

দাহন করিয়া আমরা রন্ধনাদি করিয়া থাকি, তাহাতে বায়ুস্থ অম্লজান বাষ্পের যোগে, এক ভয়ানক প্রাণ-নাশক বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহাকে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প কহে। ইহা নিশ্বাস দ্বারা শরীরে গৃহীত হইলে, প্রথমতঃ নানা প্রকার অসহ্য ক্লেশ, ও অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছেন, ও ইহাতে ক্রমে ক্রমে যে রূপে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের বিবরণ পাঠ করিলে চিত্ত স্তম্ভিত হয়।

দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্পের যে অপকারিণী শক্তির উল্লেখ করা গেল, তাহা আবার আমাদের শরীরেই উৎপন্ন হইতেছে। নিশ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিলে, উহার অম্লজান বাষ্প সহকারে শরীরস্থ অঙ্গার, উক্ত বাষ্পরূপে পরিণত হয়, তখন তাহা শরীরে থাকিলে বিষতুল্য হইবে বলিয়াই, ফুসফুস হইতে প্রশ্বাস দ্বারা বহিষ্কৃত হইতে থাকে। কোন কারণ বশতঃ তাহা বাহির হইতে না পারিলে শরীরেই থাকিয়া যায়, তাহাতে অপকার হইয়া উঠে। বায়ু অভাবে আরও একটী দুর্ঘটনা হয়। দূষিত রক্তে যে অঙ্গারের ভাগ থাকে, তাহাতে নিশ্বাস দ্বারা বায়ু সংযোগ না হইলে, তাহা আর বহিষ্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং রক্তের সহিত শরীরের সর্ব্বস্থানে

চালিত হইয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া ফেলে। এরূপে প্রতি মিনিটে দেড় রতি পরিমিত অঙ্গার রক্তে যোজিত হইতে থাকে; সেই রক্ত মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া প্রথমতঃ সংজ্ঞাহরণ ও ৫।৬ মিনিটের মধ্যে জীবন শেষ করিয়া ফেলে। বায়ু অভাবে এইরূপেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে বিশুদ্ধ বায়ুর ২০০০ ভাগের একভাগ দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প, কিন্তু প্রশ্বাস দ্বারা ফুসফুস্ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহার ২০০০ ভাগে ১০০ ভাগ উক্ত বাষ্প পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু বাহির হয়, তাহা পুনর্বার গ্রহণ করা অনুচিত। পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলে তাহাতে অশেষ ক্লেশ ও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ের অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বহু লোক একত্রিত হওয়াতে, কয়েক ঘণ্টা গত হইতে না হইতে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন ভিন্ন আর কেহই জীবিত ছিল না। ইহারা, পুনঃ পুনঃ প্রশ্বসিত বায়ু গ্রহণ করিয়া, যে ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

গৃহের বাহিরে সর্ব্বদা বায়ু সঞ্চরণ করিতে থাকে। এরূপ স্থানে বহু সঙ্খ্যক লোক সমাগত হইলে কোন ক্ষতি

নাই; কারণ বায়ুযোগে প্রশ্বসিত অঙ্গারক বাষ্প ইত-স্ততঃ চালিত হইয়া যায়। কিন্তু গৃহমধ্যে বা আবৃত স্থানে অধিক লোক একত্রিত হইলে, নানা অনিষ্ট ঘটি-য়া থাকে। আমাদের বাসগৃহ যে কদর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাহাতে বায়ু সঞ্চালনের উপায় নাই, হয়ত বায়ু প্রবেশের পথই থাকে না। একে গৃহাদি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আবার রাত্রিকালে অনেকে একগৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। গৃহে হয়ত জানালা নাই, থা-কিলেও তাহার সম্মুখে কড়ু জানালা না থাকাতে, বায়ু গমনাগমন হয় না। গ্রীষ্মকালে গবাক্ষাদি খোলা থাকে, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু শীতকালে তাহার কোন উপায়ই থাকে না। অভ্যাস দোষে এরূপ গৃহে বাস করাতে কোন উপস্থিত কষ্ট দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহাতে নানা রোগের সঞ্চার হইয়া থাকে।

আমাদের বাসগৃহ প্রশস্ত হওয়া উচিত। প্রশস্ত গৃহে ২।৩ জন বাস করিলে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিতে হইলে, অন্ততঃ তাহার চারিদিকের দেয়ালের ঊর্দ্ধ ও অধঃ দিগে ৮টী ছিদ্র রাখা উচিত। ছিদ্র, দীর্ঘে ৪ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৪ ইঞ্চ হইলেই তদ্দ্বারা দূষিত বায়ু বহির্গত ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হইতে

পারে। প্রশ্বসিত দ্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প, বায়ু অপেক্ষা ভারী, এজন্য ইহা ভূতলে অবস্থিত হয়। ত্বক্‌ প্রভৃতি দ্বারা অন্যান্য যে সকল বাষ্প নির্গত হয়, তৎসমুদায় বায়ু অপেক্ষা লঘু এজন্য তাহারা ছাতের দিকে গমন করে। দেয়ালের ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে ছিদ্র থাকিলে উভয় প্রকার বাষ্পই বাহির হইয়া যাইতে পারে।

তৃণ, লতা, ও মৃত পশ্বাদির শরীর, জল বায়ু ও রৌদ্রযোগে নিয়তই পচিয়া যায়, তাহাতে নানা প্রকার বাষ্প উত্থিত হইয়া বাহ্য বায়ুকে অনুক্ষণ দূষিত করে। অসহ্য দুর্গন্ধ দ্বারা আমরা মধ্যে মধ্যে এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি, কিন্তু কখন কখন তাহারা ইন্দ্রিয় বিশেষের অগ্রাহ্য থাকিয়াও, রোগ মৃত্যু ও শোক-জনিত হাহাকার ধ্বনি বিস্তার করিয়া থাকে। আর্দ্র ও জলাকীর্ণ ভূমিতেই এই সকল ভয়ানক পদার্থ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও অনিষ্টকারী হয়, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল স্থানে মারীভয় হইয়াছে, তাহার অনেক গ্রামই স্রোত বিহীন নদী বা বীলের সন্নিহিত, অথবা তত্তৎ গ্রামে দুর্গন্ধময় পুষ্করিণী ও গর্ত্তের সংখ্যা অধিক। মারীভয়ের প্রকৃত কারণ কি তাহা নির্দ্দেশ করা সহজে নহে, কিন্তু আর্দ্র ও জলাকীর্ণ স্থানে বাস ও

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে যে তাহার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

এদেশের অনেক প্রাচীন গ্রামেই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়; অনেক স্থানে গৃহাদি নিতান্ত পরস্পরের সন্নিহিত থাকিয়া বায়ুরোধ করে। এই সকল কারণে পীড়ার আতিশয্য হইবারই সম্ভাবনা।

দিবসে রৌদ্র পাইলে বৃক্ষাদির পত্র হইতে অম্লজান বাষ্প নির্গত হয়, কিন্তু রাত্রিকালে তৎপরিবর্ত্তে অঙ্গারক বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। অতএব, গৃহের অভ্যন্তরে বা নিকটে পুষ্প বৃক্ষশাখা বা লতাপত্রাদি রাখিলে, বায়ুকে কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত করিতে পারে। রাত্রিকালে বৃক্ষতলে বাস করিলে অপকার হয় জানিয়া, এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালী, গর্ত্ত প্রভৃতিতে লবণ বা পাথরিয়া চূণ নিক্ষেপ করিলে, এক প্রকার রাসায়নিক কার্য্য উপস্থিত হয়; তাহাতে দূষিত পদার্থ সকল রূপান্তরিত হইয়া যায়। পীড়িত ব্যক্তির বাসগৃহে, নানা প্রকার দুর্গন্ধময় ও দূষিত বাষ্প উদ্ভূত হইয়া তত্রস্থ বায়ুকে অনিষ্টকর করে; তখন, লবণ বা পাথরিয়া চূণে জল মিশাইয়া, গৃহের সকল স্থানে বিক্ষিপ্ত করিলে, ও

গৃহের চতুর্দ্দিকে অঙ্গার, লবণ বা চূণ রাখিয়া দিলে, গৃহের বায়ুতে [illegible] দোষ থাকে না।

প্রাতঃকালে ও বৈকালে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহে প্রত্যাগমন না করিলে, প্রখর রৌদ্র ভোগে পীড়া হইতে পারে, এজন্য অতি প্রত্যুষে বায়ুসেবনার্থে বাহিরে যাওয়া উচিত। বৈকালে রৌদ্রের হ্রাস হইলে বাহির হইয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালেই প্রত্যাগত হওয়া উচিত। শীতকালের প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগত হইতে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে অধিক ক্লেশ হয় না। সন্ধ্যাকালে বা সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকিলে, শিশির ভোগ করিয়া পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

৫ ম অধ্যায়।

পরিচ্ছন্নতা।

শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কৃত না থাকিলে, কোনমতেই স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় না। আমাদের ত্বক্‌দ্বারা যে সকল দূষিত পদার্থ অনবরত বাহির হইতেছে, তাহা কোন রূপে শরীরে থাকিয়া গেলে রোগ জন্মিতে পারে। ত্বকের

অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়, তাহাতে যে সকল পদার্থ নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ কঠিন হইয়া শরীরে লগ্ন হইয়া থাকে। শরীরের মল দূর করাই স্নান ও গাত্র মার্জ্জনার উদ্দেশ্য।

প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করা কর্ত্তব্য। রাত্রি কালীন বিশ্রামান্তে শরীর সবল ও সুস্থ থাকে, সুতরাং শীতল জলে স্নান করিলে শীত জনিত কষ্ট হয় না, এবং শীত ভোগ করিলে কাস, কাশ ও [illegible] যে সকল রোগ হইবা, তাহে [illegible] হইতে পা, বলা। ক্রমে শীত সহ্য হইয়া উঠে [illegible] শরীর সবল হয়। কার্ত্তিক মাঘ, ও বৈশাখ মাসে এতদ্দেশীয় অনেকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন। এ কয়েক মাস ঋতু পরিবর্ত্তন কাল। যাহা-রা প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন তাহাদিগকে প্রায়ই সুস্থ-কায় দেখা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্র কর্ত্তারা কত বিষয়েই যে আশ্চর্য্য বুদ্ধি শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

স্নান কালে শরীরে শীতল বায়ু লাগিলে যাহাদের অসুখ বোধ হয় তাহাদের পক্ষে গৃহের অভ্যন্তরে স্নান করাই কর্ত্তব্য। স্নান কালে অনবরত গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত তাহাতে অঙ্গ-চালনা হইয়া সুখানুভব করা যায়।

শীতল জলে স্নান করা উচিত বটে; কিন্তু যখন

পরিশ্রম করিয়া বা রোগের প্রাদুর্ভাবে, শরীর দুর্ব্বল হই-য়া পড়ে, তখন শৈত্যেতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এরূপ স্থলে উষ্ণ জলই প্রসিদ্ধ। শ্রম করিয়া যখন ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়, তৎকালে শরীরে শীতলজল বা বায়ু লাগিলে, তৎ-ক্ষণাৎ ঘর্ম্ম-রোধ হওয়ায় নানা পীড়া উৎপাদন করে।

উষ্ণজলে স্নান অভ্যাস করা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে, অধিক পরি-মাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয়; এবং কোন কারণবশতঃ অল্প শীত বা শিশির ভোগ করিলেই, পীড়া জন্মিয়া যায়। শরীরের স্বাভাবিক আবরণই ত্বক্; দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উষ্ণজল ব্যবহার করিলে ইহাতে আর প্রকৃত রূপে শরী-রের আবরণের কার্য্য হয় না; তখন ফ্লানেল প্রভৃতি কৃত্রিম আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয়।

স্নানান্তে, শুষ্ক মোটা কাপড় বা তোয়ালে দিয়া, গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের স্বাভাবিক তাপ উদ্ভাবিত হয়। অন্যান্য সময়েও গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। প্রত্যহ অন্ততঃ তিন বার এরূপ করা উচিত। রাত্রিকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে, ভাল করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীর পরিষ্কৃত হয়, ও তৎকালে যে অল্প ব্যায়াম হয়, তাহাতে সুনিদ্রার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠে।

স্নানের পর, আর্দ্র বস্ত্র ধারণ করিলে পীড়া হয়।

তাহার যে ভাগ শরীরে সংলগ্ন থাকে, তাহার জলের কিয়দংশ শরীরের উত্তাপে বাষ্প হইতে থাকে। কোন তরল পদার্থ বাষ্প হইবার সময় নিকটবর্ত্তী পদার্থ হইতে তাপ হরণ করে। শরীর-লগ্ন-বস্ত্রের জলদ্বারাও এই কার্য্যটী হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে শরীরের তাপ নষ্ট করে। যে প্রদেশের তাপ হৃত হয়, তত্রত্য রক্ত, স্থানভ্রষ্ট হইয়া অন্য কোন অঙ্গে গমন করিলে পীড়াদায়ক হয়।

হস্ত পদাদি অপরিষ্কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ধৌত ও শুষ্ক কাপড় দিয়া মার্জ্জিত না হইলে, পীড়া হইবার সম্ভব। রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে এই রূপ করা উচিত। পদদ্বয়ে শীতল জল সহ্য হইলে, মোজা ব্যবহার করিবার প্রথা ত্যাগ করা যায়।

আমাদের দেশের অনেকেই মলিন বসন পরিধান, ও অপরিষ্কৃত শয্যা ও স্থানে শয়নোপবেশনাদি করিয়া থাকেন, এরূপ করাতে শরীরে নানা প্রকার মলাসংযুক্ত হয়, সুতরাং তাহাতে পীড়া হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা এক বস্ত্র পরিধান করিতে গেলে তাহা পরিষ্কৃত থাকে না, অতএব গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ অন্ততঃ ২ বার ও শীতকালে ১ বার বস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত। রোগ হইলে ৩।৪ বার ঐরূপ করা আবশ্যক হয়। পরিধেয় বস্ত্র সপ্তাহে দুইবার রজকগৃহে পাঠান উচিত।

আমাদের শয্যা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া, ও সপ্তাহে

অন্ততঃ একবার শয্যাবস্ত্র পরিবর্ত্তন করা, আবশ্যক। নতুবা তাহা অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে, মন প্রফুল্ল থাকে, অপরিষ্কৃত থাকিলে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রফুল্ল চিত্তে সকল কার্য্যই করা যায় বিষণ্ণ ভাবে অতি প্রীতি-কর বিষয়েও বিরক্তি জন্মে।

যাহারা সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত থাকে, তাহাদের নানা প্রকার অসহ্য ও ঘৃণিত চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। তাহা-দের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

অন্য লোকের বস্ত্র পরিধান ও শয্যায় শয়ন করা অন্যায়, তাহাতে নানা প্রকার সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে।

৬ঠ অধ্যায়।

পরিধেয়।

নিতান্ত শীতল বা উষ্ণ বায়ু শরীরে লাগিলে ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা নিবারণার্থে আমরা বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখি। কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির সূত্রে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, আমরা সচরাচর তাহাই ব্যব-

হার করিয়া থাকি। কার্পাস অপেক্ষা রেশম ও পশমের অধিক অপরিচালকতা গুণ আছে; ইহাদের দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত থাকিলে, বাহিরের তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে ও শরীরের স্বাভাবিক তাপ বহির্গত হইতে পারে না। এজন্য শীতকালে রেশম ও পশমের অধিক পরিমাণে ব্যবহার দেখা যায়।

যখন অতিশয় শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তৎকালে শরীর সুন্দর রূপে আবৃত না রাখিলে, শারীরিক তাপ ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে প্রথমতঃ রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া স্থগিত হয়, ও পরিশেষে মৃত্যু হইতে পারে। এদেশে শীত অতি অল্প; কিন্তু রুশিয়া প্রভৃতি দেশে শীতের এত প্রাদুর্ভাব যে তত্রত্য অসংখ্য লোক আবশ্যকমত শীতবস্ত্র অভাবে সহসা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকেন। এদেশে শীতকালে অনাবৃত শরীরে থাকিলে, সহসা মৃত্যু হয় না বটে; কিন্তু তাহাতে নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিলেই শীত নিবারণ হইতে পারে। যাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল, কার্পাসের উপরি রেশম বা পশমের কাপড় ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। নিয়ত পশমী কাপড় ব্যবহার করাতে, নানা দোষ ঘটে। যাঁহারা ইংরাজ জাতির অনুকরণে একাগ্র-

চিত্র, তন্মধ্যে অনেকেই ফ্লানেল আদি পশমী কাপড় সততই শরীরে ধারণ করেন; ইহা একবারও মনে করেন না, যে ঐ সকল কাপড় ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রচণ্ড শীত নিবারণ জন্য। এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে সেখানেও ইহা তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। অন্যান্য বস্ত্রের নীচে, ফ্লানেল ধারণ করিলে ত্বকের শীত সহ্য করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার অনেক হ্রাস হইয়া আসে; ক্রমে এরূপ হইয়া উঠে, যে ক্ষণেক কাল ফ্লানেল পরিত্যাগ করিলেই, কফ, কাশ প্রভৃতি পীড়ার উদ্রেক হয়।

আমরা যে প্রণালীতে ফ্লানেল ব্যবহার করি, তাহাতে আরও একটী দোষ জন্মে। ইহা শরীর-সংলগ্ন থাকিলে, অল্প ক্ষণের মধ্যেই অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে; অপরিষ্কৃত হইবা মাত্র, অন্যতর বস্ত্র পরিধান করা উচিত। কিন্তু, আমরা তাহা করিতে পরাঙ্মুখ হই, সুতরাং অপরিচ্ছন্নতা দোষে যে সকল রোগ হইবার সম্ভাবনা, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়ই দেখা দেয়।

কয়েক বৎসর পুর্ব্বে, এতদ্দেশে ষ্টকিং-ব্যবহার ছিল না, বরং পদদ্বয় অপরিষ্কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল জলে ধৌতকরা রীতি ছিল। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই ষ্টকিং পরিধান করিতেছেন, এবং কেহ কেহ নিদ্রা কালেও ইহা পরিত্যাগ করেন না। এরূপ করাতে পদ-

দ্বয় এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া যায়, যে কোন প্রকারে শীতল বায়ু বা জল সংযুক্ত হইলেই, শরীরে রোগ উপস্থিত করে। এ দেশে যাঁহারা মধ্যে মধ্যে শীতল জলে পদধৌত করেন, ও প্রত্যূষে শীতল জলে স্নান করেন, ষ্টকিং ও ফ্লানেল ক্রয় করিতে তাঁহাদিগকে প্রায়ই বাধ্য হইতে হয় না।

এক্ষণে এতদ্দেশের পুরুষেরা যে সকল বস্ত্র ব্যবহার করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা শীতের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগা স্ত্রীলোকেরা শীত বস্ত্রাভাবে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সাটী পরিধান করেন তাহাই তাঁহাদের একমাত্র বস্ত্র; শিল্প নৈপুণ্য দোষে তাহাও আবার এত সূক্ষ্মসূত্র-বিনির্ম্মিত হইতেছে, যে তদ্দ্বারা না দেহাবরণ, না শীত নিবারণ হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্র-জাতির স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক উত্তম। এতদ্দেশে তদ্রূপ কোন উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

বর্ষা ও শীতকালের রজনীতে, আবশ্যকমত গাত্র বস্ত্র ব্যবহার না করিয়া, এ দেশের অনেকে নানা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

রাত্রিকালে বাহিরে গমন করিতে হইলে, অপেক্ষা-

রক্ত অধিক বস্ত্র ব্যবহার করা বিধেয়। এ বিষয়ে অমনোযোগ করিয়া অনেকেই রোগগ্রস্ত হন।

রৌদ্রে বেড়াইতে হইলে, শুভ্রবস্ত্রাবৃত ছত্রদ্বারা মস্তকাদি আবৃত রাখা, এবং তৎকালে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। শুভ্র পদার্থে সূর্য্যের তাপ লাগিবা মাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র সকলে তাপ শোষণ করে; এজন্য তাহারা নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

——০০——

৭ ম অধ্যায়।

বাসগৃহ।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, বাসস্থান প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। অবস্থা দোষে অনেকে প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না; কিন্তু যে সকল ব্যক্তির বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে, তাঁহারাও এ বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া বৃথা ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করিয়া, বায়ু গমনাগমনের পথ এককালে রুদ্ধ করিয়া ফেলেন।

এদেশে সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণদিগ্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। যাহাতে উক্ত দুইদিগ্ হইতে নির্ম্মল

বায়ু সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার উপায় করা উচিত। উত্তর ও দক্ষিণের দিকে, ঋজু জানালা রাখিয়া দেওয়া, ও জানালার সম্মুখে বায়ু গমনের প্রতিবন্ধক না থাকে এরূপ কোন উপায় করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শীত-কালে উত্তরের জানালা, দিনমানে খোলা রাখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধ করা উচিত।

নির্ম্মাণ-প্রণালী দোষে, অনেক ইষ্টকালয়ের নীচের ঘর প্রায়ই আর্দ্র থাকে, এরূপ ঘরে মধ্যে মধ্যে চুণ ফিরান ও মেজেম করা উচিত। মেজেতে আল্‌কাত্‌রা দিলে, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এরূপ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অপেক্ষা কোন কোন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ অনেকাংশে প্রশংসনীয়।

শুষ্ক ও পরিষ্কৃত স্থানেই গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে অব্যাহত রূপে রৌদ্র ও বায়ু সঞ্চরণ করে, যেখানে নিম্ন ভূমি নাই, এরূপ স্থান মনোনীত করা উচিত। রুক্ষ বা জলাকীর্ণ স্থানে কোনমতেই বাস করা উচিত নহে। বাটীর নিকট এরূপ পয়ঃপ্রণালী রাখা উচিত, যাহাতে অনায়াসে বৃষ্টির জল বাহির হইয়া যাইতে পারে।

যে পথ দিয়া গমনাগমন করিতে হয়, তাহাতে জল বা কর্দ্দম থাকিলে পদদ্বয় সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হয়। তাহাতে জ্বর, কফ, কাশ প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। এজন্য

গৃহের জল বাহির করিবার জন্য, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

এ দেশের অনেকেই গৃহের নিকটে দুর্গন্ধময় গর্ত্ত এবং নানা প্রকার আবর্জ্জনারাশি রাখিয়া দেন। তদ্দ্বারা বায়ু দূষিত হয়, সুতরাং তাহাতে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়েন।

এদেশে যে কুৎসিত প্রণালীতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহাতে বায়ু গমনাগমনের পথ থাকে না। তথাকার ভূমিও নিতান্ত আর্দ্র থাকে। এরূপ গৃহ, সকল সময়েই অস্বাস্থ্য-কর, বিশেষতঃ বর্ষাকালে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। সুস্থকায়, সবল ব্যক্তিরা এরূপ গৃহে বাস করিলে অল্পকালের মধ্যেই পীড়িত হইয়া পড়েন; কিন্তু এদেশের প্রসূতি ও সদ্যোজাত সন্তানেরা এরূপ দুর্ভাগ্য, যে তাহাদিগকে তথায় বাস করিয়া নানা প্রকার ক্লেশকর রোগ ও অকাল মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হয়। আমরা, প্রাচীন কুপ্রথার অনুগামী হইয়া এই বিষয়ে কত গুরুতর অপরাধ করিতেছি, তাহা বর্ণন করা যায় না। দেশস্থ ভদ্রলোকেরা মনোযোগ না করিলে, ইহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই *।

---

* বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রণীত "শিশুপালন" গ্রন্থ পাঠ করিলে, প্রসূতি ও শিশু সন্তানদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন।

৮ম অধ্যায়।

ব্যায়াম।

জগদীশ্বর আমাদের শরীর পরিশ্রমোপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শরীরের যে অঙ্গ উপযুক্ত রূপে সঞ্চালিত হয়, তাহা বর্দ্ধিত পুষ্ট ও শ্রমক্ষম হইয়া উঠে, আবার সঞ্চালিত না হইলে তাহারা দুর্ব্বল, শীর্ণ ও শিথিল হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অঙ্গ যত পরিচালিত হয়, তাহা তত শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই ক্ষতি নিবারণ জন্য, তদভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র রক্ত-সঞ্চার হয়, তাহাতে তাহারা পুষ্ট হইতে থাকে। যে রক্তদ্বারা শরীরের ক্ষতি নিবারণ হয়, সেই রক্ত আবার ভুক্ত অন্ন হইতে গৃহীত হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পরিমাণে আহার করিলে সুস্থ থাকা যায়, তৎপরিমিত পরিশ্রম করাই উচিত। তাহার অধিক পরিশ্রম করিলে, ভুক্ত অন্নদ্বারা আর সম্পূর্ণ রূপে শরীরের ক্ষয় নিবারণ হয় না; সুতরাং অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ শরীর দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অঙ্গ বিশেষ যে, পরিশ্রম দ্বারা সবল ও বর্দ্ধিত হয়, সচরাচর ইহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। যান-

বহন করিয়া বেহারাদিগের স্কন্ধ দেশ স্থূল ও মাংসল হইয়া উঠে, ও নৌকা চালনদ্বারা মাজীদিগের হস্তাদির পেশী সকল সংবর্দ্ধিত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। পদাতিক ডাক্ হরকরা বা পত্রবাহকেরা, সর্ব্বদা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের পদ দেশের পেশী সকল বিলক্ষণ শক্ত ও স্থূল দেখা যায়। আবার যাহারা কোন প্রকার পরিশ্রম করে না, তাহাদের শরীর নিতান্ত কোমল ও শিথিল হইয়া যায়; তাহাদের অস্থি সমূহ এত কোমল, যে সামান্য ছুরিকা দ্বারা অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কোন অঙ্গ-চালনার ইচ্ছা হইলে, সেই ইচ্ছা মস্তিষ্ক দ্বারা উক্ত অঙ্গের স্নায়ুতে বিজ্ঞাপিত হয়; তৎক্ষণাৎ আবার সেই স্নায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত অঙ্গের পেশী সঙ্কুচিত হয়, তাহাতেই অঙ্গসঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতএব, অঙ্গ-চালনা বিষয়ে ইচ্ছাই একমাত্র প্রবর্ত্তিকা। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেরূপ পরিশ্রম করিলে, মনের ক্লেশ হয় না, তাহা অতি সহজে করা যাইতে পারে। অনিচ্ছার সহিত কর্ম্ম করিতে গেলে, মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, সুতরাং স্নায়ু সকল আবশ্যকমত কার্য্য করে না, তাহাতে অল্প ক্ষণের মধ্যে অঙ্গ সকল ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এজন্য প্রফুল্ল মনে পরিশ্রম করা উচিত। আন্তরিক

যত্ন থাকিলে, লোকে কত পরিশ্রম করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শুনা গিয়াছে, প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট, উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া, ৬ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পথ অশ্বারোহণে গমন করিয়া ছিলেন। অর্থ লোভে কোন কোন দুস্যদল ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে পদব্রজে ৩০ ক্রোশ পথ ভ্রমণ ও সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিয়াছে, সচরাচর এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

পরিশ্রম বিষয়ে অভ্যাসই প্রধান। কোন কোন ব্যক্তি অল্প পরিশ্রম করিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়ে; কেহ বা তদপেক্ষা ১০।১৫ বা ২০ গুণ শ্রম করিয়াও ক্লিষ্ট হয় না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে, অধিক পরিশ্রম সহ্য হইয়া উঠে। বলবান ব্যক্তিরা, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের অপেক্ষায় অধিক পরিশ্রম করিতে পারে; ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও পরিশ্রম করিতে করিতে, ক্রমে সবল হইয়া উঠে। কোন কোন রোগ, শুদ্ধ নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে।

যেমন, নিয়ত পরিচালিত হইলে অঙ্গ বিশেষের বল বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ সমুদায় শরীরের সঞ্চালন হইলে, সমস্ত শরীরের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীর শক্ত হয়, সেইরূপ আবার মানসিক পরিশ্রম করিলে মনোবৃত্তি সতেজ হইয়া উঠে। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রমই এক নিয়-

ণের অধীন। অতিরিক্ত হইলে, দুয়েতেই অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

পদব্রজে ভ্রমণ করা অতি অল্পায়াস সাধ্য। প্রত্যহ প্রত্যূষে এক বা সার্দ্ধ ক্রোশ বেড়ান উচিত। ২।৩ জন আত্মীয় একত্রে বেড়াইলে মন প্রফুল্ল থাকে, সুতরাং অধিক শ্রান্তিবোধ হয় না। বেড়াইবার সময় হস্ত ও বক্ষস্থল স্থিরভাবে না রাখিয়া, কিয়ৎপরিমাণে ইতস্ততঃ চালনা করা উচিত। অতি দ্রুতবেগে বেড়াইলে কোন কোন ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হয়। সবল ও সুস্থ শরীরেই দ্রুত গমন ক্লেশকর নহে।

অশ্বারোহণে বেড়াইলে শরীরের অনেকাংশের সঞ্চালন হয়। ইহাতে বিলক্ষণ উপকার আছে।

সন্তরণ ও দৌড়ান, অনেক সময়ে পীড়াদায়ক হয়। সন্তরণ কালে দেহস্থ রক্ত, মস্তিষ্কাভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হইয়া শিরোরোগ উৎপাদন করে ও কখন কখন আসন্ন মৃত্যুও উপস্থিত করিয়া থাকে। দৌড়াইবার সময়, রক্তের গতি অতি দ্রুত হয়; বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে হাত দিলেই হৃদয়ের কার্য্যের সত্বরতা অনুভব করা যায়। দৌড়াইলে ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে; তাহা অধিক কাল থাকিয়া গেলে, হৃদয় বা ফুস্ফুসের রোগ জন্মে। অবশেষে মৃত্যুও হইতে পারে।

এতদ্দেশের ও ইংলণ্ডের মল্লগণ নানা প্রকার

ব্যায়াম করিয়া থাকেন। তৎসমুদায় প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু তাহাদের দ্বারা শরীর এরূপ কষ্টকর কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, যে কখন কখন প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব সাধন হয়। যে সকল আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া, মনুষ্য জাতি পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন, তৎ সমুদায়ই ইহার দ্বারা সাধিত। মনুষ্যের মানসিক শক্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, ইহার বৃদ্ধির সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। যে মানসিক পরিশ্রম মনুষ্যের পক্ষে এত উপকারী, তাহা হইতে বিমুখ হইলে পশু সদৃশ হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইতে হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম যথা নিয়মে না করিলে স্বাস্থ্য ও বিবেক শক্তি রক্ষা হয় না। উভয়ই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এতদ্দেশের অনেকেই বিবেচনা করেন যে, পাঠশালায় বিদ্যা-শিক্ষার সময়ই মানসিক পরিশ্রমের প্রকৃত কাল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আমরা মানসিক পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করি, ও মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া তাহা হইতে বিরত হই। এই কালের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্য্য-দক্ষতা লাভ, পরস্পরের কর্ত্তব্যাবধারণ,

ইত্যাদি যে সকল কার্য্যে আমরা ব্যাপৃত থাকি, তৎসমুদায় মানসিক-শ্রম-সাধ্য। এক্ষণে, পৃথিবীর অনেক লোকেই, শুদ্ধ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া কথঞ্চিৎ রূপে জীবন ধারণ করিতেছেন; মানসিক শ্রম করিবার প্রবৃত্তি ও অবকাশ অভাবে, তাহাঁদিগের বুদ্ধি-শক্তি নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছে। এ দেশের স্ত্রীদিগের অবস্থাও এই রূপ। বিদ্যাভাবে ইহারা, ইহলোকের মঙ্গল সাধন ও আপনাদের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না। অন্যে দয়া করিয়া যাহা কিছু দান করে, তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন লোক, স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ের দোষে নিতান্ত নির্ব্বোধ হইয়া পড়ে। যাজনোপজীবী ব্রাহ্মণ, মন্ত্রদাতা গুরু, কোম্পানির কাগজওয়ালা মহাজন, রাজকোষ হইতে বৃত্তি ভোগী ব্যক্তি, সামান্য কেরাণী, ক্ষুদ্র দোকানদার, কৃষক প্রভৃতিকে প্রত্যহ একই নিয়মে দিন যাপন করিতে হয়; ইহাদের মনে, কোন অভিনব চিন্তার উদয় প্রায়ই হয় না। এই কারণ বশতঃ এই কয়েক শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে, অনেক অল্পবুদ্ধি লোক দেখা যায়।

[illegible] ঘণ্টা কাল মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১ ঘণ্টা কাল বিরাম করা উচিত। ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিলে পীড়া উপস্থিত হয়। পাঠাবস্থায় অনেকে রাত্রি জাগরণ করিয়া, একাসনে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম

করিয়া নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অল্প-কালের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও যশোলিপ্সু হইয়া তাঁহারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন; কিন্তু অভি-লষিত ফল পাইবার পূর্ব্বেই পীড়িত হইয়া পড়েন, অথবা তাহা প্রাপ্ত হইয়াও ভোগ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা এতদ্দেশীয় গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে অনেকেরই এই রূপ ঘটে।

নিয়মিত পরিশ্রম করিলে, কার্য্য সাধন করিতে অধিক সময় লাগিবে, এই আশঙ্কায় যশঃপ্রার্থী লোকেরা দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ৫ বৎসরের কাজ এক বৎসরে সম্পন্ন করিয়া থাকেন; এরূপ করাতে, হয়ত সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া তুলিবার পূর্ব্বেই নিতান্ত রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হন, অথবা অতি ক্লেশে আকাঙ্ক্ষিত যশোলাভ করেন। কিন্তু ইহাতে হয়ত ৩০।৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম না হইতে হইতেই শরীরে বার্দ্ধক্য ও জরার সমুদায় লক্ষণ উদয় হয়; তখন, পরিক্লিষ্ট আত্মা, ভগ্ন-দেহে অবস্থিতি করিতে অপারগ হইয়া, ত্বরায় পরলোকে প্রস্থান করেন।

৯ম অধ্যায়।

নিদ্রা।

নিয়ত পরিশ্রম করিলে শারীরিক যন্ত্র সকল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এজন্য তাহাদের বিশ্রামকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে করিতে প্রথমতঃ দৌর্ব্বল্য দেখা দেয়, ইতস্ততঃ গমনাগমনে অনিচ্ছা হয়, ইন্দ্রিয়গণ ইচ্ছার আয়ত্ত থাকে না, ও অবশেষে মনোবৃত্তি সকল এরূপ অবস্থাপন্ন হয়, যে তাহারা কোন কার্য্যই করিতে পারে না। তখন শ্রান্তিহারিণী নিদ্রা উপস্থিত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হরণ করিয়া ফেলে। পরিশ্রান্ত ও শোকতাপাকুলিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, নিদ্রা যেরূপ মহোপকারিণী তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ফলতঃ নিদ্রা না হইলে আমাদের নানা রোগ ও অচিরাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

রাত্রিকাল নিদ্রার প্রকৃত সময়। দিবসে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত হইলে, নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়। যাহারা পরিশ্রমবিমুখ, তাহারা বহু ব্যয় করিয়াও সুনিদ্রা রূপ অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ আবার, এরূপ

দুর্ভাগ্য যে দিবাভাগ নিদ্রায় অতিপাতিত করেন, ও রাত্রিকালে নিতান্ত অস্থির হইয়া নানা প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাকে আহ্বান করেন; কিন্তু এরূপ লোকের কখনই সুনিদ্রা হইবার সম্ভাবনা নাই।

শরীর সুস্থ না থাকিলে সুনিদ্রা হয় না। তখন নানা প্রকার স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে। অজীর্ণ দোষ নিদ্রার অতিশয় প্রতিবন্ধক; এজন্য নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে গুরুতর ভোজন করা অন্যায়।

শয়নের পূর্ব্বে ক্রোধ, দ্বেষ, বিরক্তি প্রভৃতি ক্লেশকর ভাবোদয় হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; এজন্য তৎসমুদায় পরিত্যাগ করা উচিত। তৎকালে আমোদ প্রমোদ করিয়া সকৃতজ্ঞ-চিত্তে জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলে, যেরূপ সুখী হওয়া যায় এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

শয়নের পূর্ব্বে, হস্ত পদ ও মুখ ধৌত করিয়া, তোয়ালে বা মোটা কাপড় দিয়া গাত্রমার্জ্জন করা উচিত। তখন ফ্লানেল প্রভৃতি কাপড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যে পরিমাণে কার্পাসের কাপড় ব্যবহার করিলে শীত নিবারণ হয়, তাহা দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করা বিধেয়।

আমাদের শয্যা নিতান্ত কঠিন বা কোমল হইলে,

নানা প্রকার দোষ ঘটে। শিশুদিগের শয্যা অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়া আবশ্যক।

বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করা উচিত। চিত হইয়া শয়ন করিলে বক্ষঃস্থলে দুঃসহ ভার বোধ হয়, ও নানা প্রকার ভয়ানক স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ইহাকেই লোকে "বুক-চাপা" বলে। রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হওয়াতেই এই ক্লেশকর পীড়া উপস্থিত হয়, এবং ইহাতে কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুও হইয়া থাকে।

শয়নকালে গাত্রাবরণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু তাহা অতিরিক্ত পরিমাণে ধারণ করিলে, শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া ফেলে। নিদ্রাকালে, গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ নাসিকাদি আবৃত রাখা অন্যায়। এরূপ করিলে, পুনঃ পুনঃ প্রশ্বসিত দূষিত-বাষ্প গ্রহণ করিতে হয়; তাহাতে পীড়া ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শয়ন গৃহে বায়ু-সঞ্চালনের বিশেষ পথ রাখা উচিত। কেহ কেহ রাত্রি কালীন বায়ুকে এত ভয় করেন, যে তাহা কোনমতেই গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে, নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এমন কি, জানালা ও দ্বারের সন্ধিস্থানে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিলেও, তাহা তুলা বা ছিন্নবস্ত্রদ্বারা

রোধ করিয়া থাকেন। এদেশে এত সশঙ্ক হইবার প্রয়োজন নাই। এরূপ করিলে কেবল বায়ু গমনাগমনের পথ রোধ করা হয় এই মাত্র।

এদেশে শীতকালে ৭।৮ ঘণ্টা ও গ্রীষ্মকালে ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা গেলেই যথেষ্ট হয়। যাহারা নিতান্ত রুগ্ন বা দুর্ব্বল, তাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের প্রয়োজন। অভ্যাসানুসারে নিদ্রার সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। কেহ কেহ আহার করিবা মাত্র নিদ্রাকৃষ্ট হন, অন্য কেহ কিয়ৎকাল পরে নিদ্রা যাইয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে ১০টা ও শীতকালে ৯½ টার সময় শয়ন করিয়া, প্রত্যূষে উঠিলেই যথেষ্ট হয়।

---

১০ ম অধ্যায়।

মনোবৃত্তি।

শরীর ও মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। শরীর রুগ্ন হইলে মনোবৃত্তি সকল বিকৃত হইয়া যায়, ও মানসিক কষ্ট হইলে শরীর অসুস্থ হয়, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ক্ষুধাকালে ক্রোধ, শোক প্রভৃতির উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষুধা অন্তর্হিত হয়। কেহ কেহ প্রবল চিন্তাবেগে, ২।৩ দিন অনাহারী থাকেন।

মনোবৃত্তি সকল সর্ব্বদা উত্তেজিত হইলে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়; অতএব যাহাতে মনে কোন উপদ্রব না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দেখা গিয়াছে, যাহারা সর্ব্বদা রাগ দ্বেষাদির বশীভূত, তাহারা দীর্ঘ-জীবী হয় না।

যাহারা সর্ব্বদা প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মনে থাকেন, তাঁহারা অধিক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হন না। ভোজন-কালে আমোদ প্রমোদ করিলে, অতি শীঘ্র পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়।

মনুষ্যদিগের নানা প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে। তৎসমুদায় প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের বশীভূত হইলে পশুতুল্য হইতে হয়। এই সকল বৃত্তি প্রবল হইলে, শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তিরই হ্রাস হয়, ও পরিশেষে রোগ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া প্রাণ সংহার করে।

সমাপ্ত।

Printed by J. G. Chatterjea & Co.

THE

ELEMENTS

OF

NATURAL PHILOSOPHY

In Bengali.

PART II.

(Mechanics and the Steam Engine.)

BY

BHOODEB MOOKEJEA.

প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় ভাগ।

(যন্ত্র-বিজ্ঞান এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের বিবরণ।)

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE 'SUCHARU PRESS,' BY LALLCHAND BISWAS & CO.

NO. 13, BAHIR MIRZAPORE.

1859.

[মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।]
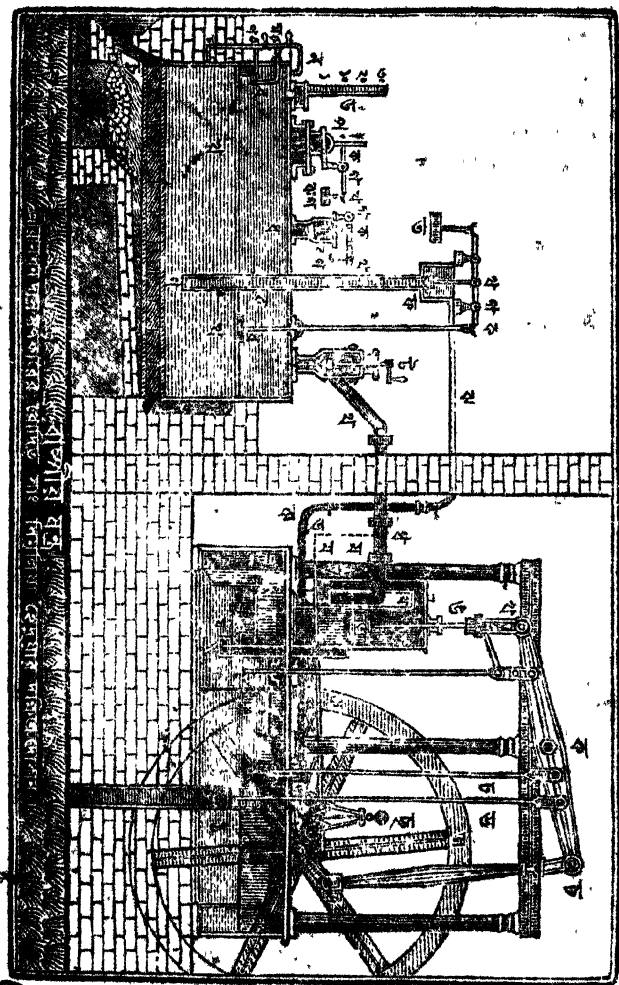
বাষ্পীয় যন্ত্র

বিজ্ঞাপন।

প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় খণ্ডে যন্ত্র-বিজ্ঞান এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের বিবরণ লিখিত হইল। ইহার অন্তর্গত কঠিন বিষয় সমস্তকে পাঠকবর্গের বোধ-সুলভ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা গিয়াছে। এক্ষণে যদি এই দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয় তাহা হইলেই সফল-প্রযত্ন হইব।

যন্ত্র-বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

[যন্ত্র কি?—বল কি?—ভার কি?—বল এবং ভার পরিমাণের রীতি কিরূপ?]

যে সকল উপায় দ্বারা এক স্থানে প্রযুক্ত বল স্থানান্তরে ভিন্নরূপে কার্য্যকারী হয় তাহাকেই যন্ত্র বলা যায়। ঢেঁকির এক দিক্ পায়ে করিয়া চাপিলে তাহার অন্য দিক্ উচ্চ হইয়া উঠে এবং সেই মুষল ধান্যাদির উপর বল-পূর্ব্বক পতিত হইয়া তাহাদিগের শস্যের এবং খোসার পরস্পর সংযোগ বিনাশ করে। যখন্ হল চালিত হয় তখন্ বলীবর্দ্দ সরল রেখায় চলিয়া যায়, যে ব্যক্তি হল চালন করে সে হলের মুখ-ভাগটী মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ধরে; কিন্তু ঐ দুই বলে মৃত্তিকা বিস্ফারিত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া দুই পার্শ্বে পড়িতে থাকে। ঘানিগাছের গরু অবিরত চক্রাকারে ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার বলে

[illegible] ভিতরের শর্ষপাদি মর্দ্দিত হইয়া তৈল [illegible] মনুষ্য কর্ত্তৃক কুঠার উত্তোলিত হইয়া [illegible] আহত হইলে কাষ্ঠ পার্শ্বের দিকে ফাটিয়া যায়। এই সকল স্থলে বল প্রয়োগ এক স্থানে এক প্রকারে হইতেছে, কিন্তু তাহার কার্য্য ভিন্ন স্থলে ভিন্ন রূপ বলের কার্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, সুতরাং যাহাদিগের আশ্রয়ে এই রূপ হইতেছে সেই ঢেঁকি, লাঙ্গল, ঘানিগাছ এবং কুঠার এই সকল গুলিই যন্ত্র।

যাহা দ্বারা যন্ত্র পরিচালিত হয় তাহাকে বল কহা যায়। বল নানা প্রকার হইতে পারে। ঢেঁকি মনুষ্যের বলে উঠে; লাঙ্গল, মনুষ্য এবং বলীবর্দ্দ উভয়ের বলে চালিত হয়; গরুর বলে ঘানিগাছের শর্ষপ মর্দ্দিত হয় এবং মনুষ্যের বলে কুঠার উত্তোলিত হয়। এই রূপ বাষ্পের বলে বাষ্পীয় শকটাদির গমন হয়—বায়ুর বলে বোমায় জল উঠে এবং স্থিতি-স্থাপক স্প্রিংএর বলে ঘটী যন্ত্রের কাঁটা চলে।

[যন্ত্রের যে ভাগে বল প্রযুক্ত হয় তাহার নাম 'প্রয়োগ-স্থান'।]

যন্ত্র দ্বারা অসংখ্য প্রকার কার্য্য সাধন হয়, কিন্তু কার্য্য যে প্রকার হউক না কেন তাহার সাধনার্থ অবশ্যই উহার কোন রূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ করিতে হয়। সেই প্রতিবন্ধকের নাম 'ভার'। ঢেঁকির আঘাত দ্বারা তণ্ডুলের এবং তাহার তুষের পরস্পর সংযোগ বিনাশ করা যায়।

ঐ তুষ এবং তণ্ডুল যে বলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে সেই সংযোগ-বলকেই 'ভার' কহা যায়। লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা উৎপাটিত হয়। যে বলে মৃত্তিকা পরস্পর সংযত হইয়া থাকে সেই বলকেই 'ভার' বলা গিয়া থাকে। ঘানিগাছে শর্ষপ মাড়া যায়। তৈলের উপর শর্ষপের খোসা যে বলে আবৃত হইয়া থাকে তাহাই 'ভার'। যখন্ কোন বাষ্পীয় নৌকা বাষ্পের বলে বায়ুর প্রতিকূল মুখে গমন করিতে থাকে তখন্ বায়ু যে বলে উহাকে পশ্চাদ্ভাগে আনিতে চেষ্টা করে এবং পৃথিবী উহাকে যত বলে আকর্ষণ করিয়া এক স্থানে বদ্ধ রাখিতে চাহে আর জলের প্রতিকূল ঘর্ষণ যত, এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধকই উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্রের 'ভার' বলিয়া গণ্য হয়।

যন্ত্রের যে ভাগে 'ভার' বিনাশ হয়, তাহার নাম 'কার্য্য-স্থান'।

যন্ত্রের পরিচালক বল এবং তদ্দ্বারা সম্পাদিত কার্য্যও বিবিধ প্রকার হয়। কিন্তু বল এবং কার্য্য এ উভয়ের নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্ব প্রকার বল এবং ভারকে এক জাতীয় করিতে হয়। কারণ এক জাতীয় না করিলে কোন প্রকারেই উহাদিগের পরস্পর তুলনা হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, মনুষ্যেরা দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালাইতেছে—পাইল দ্বারাও বায়ু সংযোগে নৌকার গতি হইতেছে—এবং বাষ্পের বলেও নৌকা চলিতেছে—এই

তিন প্রকার বলের পরস্পর তুলনা করিতে হইলে ঐ তিন বলকেই এক প্রকার সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা আবশ্যক। অর্থাৎ এমত বলিতে হয় যে, পাইল দিলে পাঁচটা দাঁড়ের কর্ম্ম করে—বাষ্পীয় যন্ত্র যোগে এক শত দাঁড়ের ফল হয়, ইত্যাদি। এই রূপ বলিলেই বুঝা যায় যে, ঐ স্থলে বায়ুর বল পাঁচ জন মনুষ্যের বলের সমান এবং বাষ্পের বল ১০০ ব্যক্তির বলের সমান। ইহারই নাম বলের একজাতি করণ।

পণ্ডিতেরা সর্ব্ব প্রকার বলকে একজাতীয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বায়ুর বল পাঁচ জন মনুষ্যের বলের সমান, এমত না বলিয়া এই বিবেচনা করেন যে, মনুষ্যের বল বা অন্য কোন প্রাণীর বল সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বদেশে ঠিক্ সমান থাকে না, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের বল চিরকাল একই থাকে, অতএব বায়ু বা অপর কোন বল যাহাকে কোন দিকে টানিতেছে সেই দিকে ঠিক্ কত ভারী দ্রব্য কোন রূপ কৌশলে ঝুলাইয়া দিলে উহার পূর্ব্ববৎ গতি থাকিবে; এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সকল প্রকার বলকে একজাতীয় করা বিধেয় হইয়াছে। যত ভারী দ্রব্য ঝুলাইয়া দিলে ঐ গতি থাকিবে তাহার ভার পরিমাণই বায়ুর বা অপর কাহার বলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্ব প্রকার বলকেই যে, মণ, সের, ছটাক ইত্যাদি ভার

পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহা স্পষ্ট বোধ হইতে পারে। বোধ কর, যেন এক খানি কাঠের মেজের উপর কোন বস্তু আছে। ঐ দ্রব্যে দড়ি বাঁধিয়া টানা যাইতেছিল। যদি জিজ্ঞাস্য হয় যে, উহা কত বলে আকৃষ্ট হইতে ছিল, তবে সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করিবার নিমিত্ত ঐ দড়িকে উক্ত মেজের এক পার্শ্বে ঝুলাইয়া তাহার অপর প্রান্তে একটী ভার বান্ধিয়া দিলে যদি ঐ ভারে উক্ত বস্তুটী সরিয়া আসিতে থাকে এবং তাহার বেগও পূর্ব্বের সমান হয় তবে ঐ ভারকে পরিমাণ করিয়া যত সের বা মণ বা ছটাক হইবে, আমরা মেজেরা উপরিস্থিত দ্রব্যটীকে সেই পরিমিত বলে টানিতেছিলাম ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি।

তীয় অধ্যায়

[যন্ত্রের প্রকৃতি বিবেচনা করিবার রীতি কেমন?—যন্ত্র সহকারে বলের লাভ হয় এই কথার তাৎপর্য্য কি?।]

যখন্ কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়, তখন্ সেই বিষয়টী কঠিন হইলে, এক বারে তাহার সিদ্ধান্ত স্থির করিতে না পারিয়া, আমরা মনে২ ঐ বিষয়টিকে ভাগ করিয়া লই এবং ক্রমশঃ তাহার প্রত্যেক ভাগের প্রতি মনোযোগী হইয়া বিচার করত পরিশেষে সমুদায় বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। যন্ত্র-বিজ্ঞান কাণ্ডেও

সেই রূপ করা আবশ্যক। যন্ত্র সমস্তের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ উহারা যেং পদার্থে জন্মে তাহাদিগের নিশ্চেষ্টতা, বন্ধুরত্ব এবং ভুনম্যতা প্রভৃতি গুণের প্রতি দৃষ্টি করা যায় না, আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে উহাদিগের যে ভার আছে, তাহাও গণ্য করা যায় না, অপিচ বায়ুর প্রতিবন্ধিতাও তৎকালে স্বীকার্য্য হয় না। কারণ ঐ সকল লইয়া একেবারে বিবেচনা করিতে গেলে অত্যন্ত গোলোযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব প্রথমে কেবল 'যন্ত্রের প্রকৃতি কিং' ইহার ই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। তাহার পর একেং, উক্ত গুণ সকল থাকাতে ঐ প্রকৃতির কিরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়।

এক্ষণে যেরূপ যন্ত্রের প্রকৃতি কথিত হইবে, অবিকল তেমন যন্ত্র একটীও নির্ম্মিত হইতে পারে না। কারণ, বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই সকল যন্ত্রের কাষ্ঠ লৌহাদি সর্ব্বতোভাবে ভার-বিহীন এবং ঘর্ষণ বর্জ্জিত— ইহাতে যে সকল শৃঙ্খল এবং রজ্জু ব্যবহৃত হয় তাহারা সর্ব্বতোভাবে নম্য—আর এই যন্ত্র যে স্থানে চলে সেই স্থানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও নাই।। যদি বল এমত যন্ত্র যদি, কদাপি নির্ম্মিতই না হইল, তবে তাদৃশ পদার্থের প্রকৃতি অনুসন্ধানের ফল কি?। ইহার উত্তর, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্ব স্থলেই প্রথমতঃ এইরূপ করিয়া বিবেচনা করিতে হয়—অর্থাৎ যে বিষয়টী বুঝিতে হইবে প্রথমে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য অবগত হইয়া পরে সূক্ষ্মা-

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ঐ বিষয় কদাপি বোধগম্য হয় না।

যন্ত্র সকলের দ্বারা অল্প বল প্রয়োগ করিলে অধিক বলের কার্য্য হয়, অনেকেই এই রূপ কহিয়া থাকেন। যদি বাস্তবিক তাহাই হইত তবে যন্ত্র সকলকে অলৌকিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, যৎপরিমাণে কারণ প্রবল হইবে তৎপরিমাণে কার্য্যেরও আধিক্য হইবে। বল, ভার নিবারণের কারণ। সুতরাং যদি অল্প বলে অধিক ভার নিবারিত হয় তবে কারণ দুর্ব্বল হইয়াও প্রবল কার্য্যের উৎপাদক হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক কোন স্থলেই এইরূপ হয় না।

যন্ত্র মাত্রেরই কতক গুলি অবলম্ব স্থান আছে। সেই সকল অবলম্ব দ্বারা ভারের অধিকাংশই বাহিত হয়, সুতরাং বলের আপনার যে পরিমাণ উহা সেই পরিমাণ মাত্র ভারকে বহন করে, কদাপি তাহার অধিক বহন করিতে পারে না। বিশেষ২ যন্ত্রের বিবরণ কালে এই বিষয় অধিক স্পষ্ট করা যাইবে। সম্প্রতি ইহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।—এক খানি বৃহদাকার কাষ্ঠের নীচে এক খণ্ড বাঁশের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়া এবং ঐ বাঁশের নীচে একটা ইট রাখিয়া যদি বাঁশের অপর প্রান্তে কেহ চাপ দেয় তবে ঐ এক জনের বলে তেমন বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ডও উন্নত হইয়া উঠে। এই স্থলে বোধ হইতেছে যেন, অল্প বলে অধিক ভার উত্থিত হইল।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। উক্ত বাঁশের অবলম্ব ইষ্টক খানি ঐ কাষ্ঠের ভার বহন করিয়া ছিল। মনুষ্য কর্ত্তৃক যে অতিরিক্ত বল প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারাই কাষ্ঠ উত্তোলিত হইল।

যদি বল যে, ঐ ইষ্টকরূপ অবলম্বের সাহায্যে যদিও পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠ খণ্ড ইষ্টকের উপরেই ভর দিয়া থাকিতে পারে এমত হয় বটে, কিন্তু এক জন সামান্য মনুষ্যের বলে উহা যে, উন্নত হইয়া উঠিল, অর্থাৎ উহার যে ঊর্দ্ধ-মুখে গতি জন্মিল তাহার কারণ কি?—তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই স্থলে কার্য্যের প্রতি বাস্তবিক কত বল প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। কাষ্ঠ খানি যদি এক শত মণ ভারী হয় এবং উক্ত বংশ খণ্ড সংযোগে যদি উহা এক অঙ্গুল প্রমাণ উন্নত হইয়া উঠিয়া থাকে তবে ঐ কাষ্ঠের বেগ-বল (মণ ১০০×১ অ-ঙ্গুলি)=১০০ মণ হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি কাষ্ঠকে উন্নত করিয়াছে সে অবশ্য উহার প্রতি ১০০ মণ পরি-মিত বল প্রযুক্ত করিয়া থাকিবে। কিন্তু সে এত বল কোথায় পাইল?।

এই স্থলে বিবেচনা করা উচিত যে, যদি ঐ কাষ্ঠ খানি সমান এক শত অংশে বিভক্ত হইত এবং কোন যন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তির বলে ঐ এক শত খণ্ড একেং এক শত বার একং অঙ্গুলি করিয়া উন্নত হইতে পারিত, তবে ঐ ব্যক্তির বেগ ঠিক ১০০ শত অঙ্গুলি স্থান

পরিমিত হইত। সুতরাং তাহার বেগ-বল (১ মণ×১০০ অঙ্গুলি)=১০০ মণ হইত। অতএব বোধ হইতেছে ঐ ব্যক্তির বেগ অধিক হওয়াতেই তাহার বেগ-বল তাদৃশ অধিক হইয়াছে।

ফলে তাহাই দেখা যায়, ঐ কাষ্ঠ যে সময়ে ১ অঙ্গুলি মাত্র উঠিবে সেই সময় মধ্যে যে তাহাকে উত্তোলন করিতেছে তাহার হাতও ১০০ অঙ্গুলি প্রমাণ নত হইয়া আসিবে।

অতএব বলের এবং ভারের বেগ-বল চিরকাল সমান থাকে। বল গুরু হইলে তাহার বেগ অল্প হয় এবং বল লঘু হইলে তাহার বেগ অধিক হওয়া আবশ্যক। ইহাই যন্ত্র-বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্র। ইহার তাৎপর্য্য কখনং এরূপে প্রকাশিত হয় যথা, বলের লাভ করিতে গেলে বেগের লোক্সান এবং বেগের লাভ করিতে গেলে বলের লোক্সান করিতে হয়।

এক্ষণে এই মাত্র বিবেচনা কর যে 'বেগ' বলেরই কার্য্য। সুতরাং যখন্ বল লঘু হইয়াছে বলিয়া বেগের আধিক্য দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করা যায়, তখন্ বাস্তবিক বলই দেওয়া হয়। সুতরাং যন্ত্র সহযোগে বলের লাভ হয় একথা সামান্যতঃ বুঝা কর্ত্তব্য নহে। কার্য্যের এবং কারণের বেগ-বল সর্ব্বদা সমান থাকে এমত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বল লঘু হইলে বেগের আধিক্য দ্বারা তাহা পূরণ করা যায় এবিষয় পরে সুস্পষ্ট হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

[যন্ত্র দ্বারা বাস্তবিক লাভ কি হয়?—সাম্যাবস্থা কি?—বৈষম্যাবস্থা কি?]

পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা২ কথিত হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে, যে বংশখণ্ড সংযোগে যদিও বাস্তবিক বলের লাভ না হইয়া থাকে, তথাপি কাষ্ঠ উত্তোলন কার্য্যের অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি ঐ রূপে কাষ্ঠ উত্তোলন করে সে নীচের দিকে বল প্রয়োগ করিলেও কাষ্ঠ উপরের দিকে উঠে—দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি লঘু বল দেয় তাহাতে কাষ্ঠের গুরু ভার উন্নত হয়, পরন্তু ইহা [illegible] প্রতীয়মান হইতেছে যে, বেগ গরিষ্ঠ প্রদত্ত হয়। কিন্তু কাষ্ঠের লঘু বেগ জন্মে।

এই সামান্য যন্ত্রের যেরূপ প্রকৃতি দেখা যাইতেছে [illegible]শীর যন্ত্র প্রভৃতি অতি অসামান্য যন্ত্র সকলেও অবিকল এই রূপ প্রকৃতি দৃষ্ট হইবে। অতএব যন্ত্র মাত্রের সামর্থ্য এই অবধারিত হইল যে, তদ্দ্বারা বল প্রয়োগের দিক্ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে আর বেগের পরিবর্ত্তে বল এবং বলের পরিবর্ত্তে বেগ প্রতিনিহিত হইতে পারে।

যদি ইহাও না হইত তবে যন্ত্র নির্ম্মাণের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। যে বলের দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহা সাক্ষাৎ প্রয়োগ করিলেই হইত।

কিন্তু যন্ত্রের উক্ত কতিপয় গুণ থাকাতে লোকের কতই উপকার হইতেছে। দেখ, শর্ষপকে অন্য প্রকারে মর্দ্দন করিয়া তৈল বাহির করিতে হইলে কতই কষ্ট হইত, কিন্তু ঘানিগাছে শর্ষপ ফেলিয়া দিলে, গরু সহজে চলিয়া যাইতে থাকে, অথচ তৈল নিঃসৃত হয়। বাষ্পীয় যন্ত্রের অর্গলদ্বয় সরলরেখাক্রমে এ দিক্ ও দিক্ করিতে থাকে, কিন্তু তাহারই দ্বারা যন্ত্র বিশেষ সংযোগে বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় নৌকাদির চক্র সকল ঘূরিতে থাকে এবং ঐ সকল যান দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। ঘটী-যন্ত্রের ভিতরে একটা লৌহ পিণ্ড ঝুলে, উহা মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে নীচে নামিয়া আইসে, কিন্তু যন্ত্র সংযোগ দ্বারা উহার সেই অধোগতি, ঘটী-যন্ত্রের কাঁটার চক্রগতির উৎপাদক হয়। চরকায় যত বেগে পাক দেওয়া যায়, টক্রুটা তাহার শত গুণ অধিক বেগে ঘূর্ণিত হয় এবং চরকায় যে দিকে পাক দেওয়া যায়, টক্রু তাহার বিপরীত দিকে ঘুরে। এইরূপ সর্ব্বস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যন্ত্রের দ্বারা বল প্রয়োগের নানাবিধ সুবিধা জন্মে এবং সেই জন্যই যন্ত্রমাত্রের এত গৌরব।

যন্ত্রের বাস্তবিক লাভ এইরূপ। যেমন বণিকেরা আপনাদিগের স্থানে যে দ্রব্য অধিক থাকে তাহা দিয়া যে

দ্রব্যের অভাব তাহা বিনিময় করিয়া লন, মনুষ্যেরাও সেই রূপ যন্ত্র সহযোগে কখন বা বেগ দিয়া বল কখন বা বল দিয়া অধিক বেগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, আর কখন বা এক দিকে এক প্রকারে বল প্রদান করিয়া অন্য দিকে ভিন্ন প্রকার বল প্রাপ্ত হয়েন্। কিন্তু মনুষ্যদিগের পরস্পর বাণিজ্যে যেমন দ্রব্যের মূল্য ঠিক্ ধরা থাকে, কখন অল্প দিয়া অধিক পাওয়া যায় না এবং অধিক দিয়াও অল্প লইতে হয় না, তেমনি মনুষ্যেরা যন্ত্র সহযোগে প্রকৃতির সহিত যে বাণিজ্য করেন তাহারও দর দাম চির কাল একই প্রকার নিরূপিত থাকে। অর্থাৎ সকল যন্ত্রেরই 'কার্য্য-স্থানের' বেগ-বল এবং 'প্রয়োগ-স্থানের বেগ-বল সর্ব্ব সময়ে ঠিক্ সমান থাকে। অতএব যদি 'ব অর্থে বল এবং 'প' অর্থে তাহার পতন বা বেগ বুঝা যায় আর 'ভা' অর্থে ভার এবং 'উ' অর্থে তাহার উন্নতি কিম্বা বেগ বোধ হয়, তবে গণিত শাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম এইরূপে লেখা যাইতে পারে, যথা বXপ=ভাXউ।

যখন্ কোন যন্ত্র এই অবস্থান্বিত থাকে, অর্থাৎ উহাতে যে বল প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাকে সেই বলের বেগ দ্বারা গুণ করিলে যাহা হয় ঐ যন্ত্র দ্বারা যে ভার বিন্যস্ত হইতেছে সেই ভারের বেগ দ্বারা ভারকে পূরণ করিলে যদি ঠিক্ তত হয়, তবে যন্ত্রের সাম্যাবস্থা হইয়াছে বলা গিয়া থাকে। সাম্যাবস্থায় যন্ত্র যেমন ছিল তেমনি

থাকে। যদি সচলাবস্থায় উক্ত সাম্য হইয়া থাকে তবে যন্ত্র চলিতেই থাকিবে, আর যদি অচলাবস্থায় যন্ত্রের সাম্যভাব হইয়া থাকে তবে যন্ত্র নিশ্চল থাকিবে। ইহার প্রমাণ দেখ, যদি কোন ঘোটক ১০ মণ ভারী এক খানা শকট বহন করিয়া প্রতি ঘণ্টায় ২ ক্রোশ পথ যাইতে থাকে তবে, ঘোড়ার বেগ-বল ঐ শকটের বেগ-বলের সমান, অর্থাৎ উভয়ই (১০×২)=২০ মণ পরিমিত হয়। যদি ঘোটক অবিরত ঐ কুড়ি মণ বেগ-বল প্রদান করিতে পারে তবে শকটও সমান বেগে চলিতে থাকিবে। সুতরাং সচল থাকিয়াই উহার সাম্যাবস্থা হইবে। আবার দেখ, যদি কোন এক মণ ভারী দ্রব্যকে কোন ব্যক্তি উত্তোলন করিয়া ধরিয়া থাকে তবে ঐ এক মণ ভারী দ্রব্যেরও যত বেগ-বল যে ধরিয়াছে তাহারও তত বেগ-বল, সুতরাং ঐ এক মণের অধিক বেগ-বল প্রয়োগ না করিলে ঐ এক মণ পরিমিত দ্রব্য আর অধিক উঠিতেও পারিবে না, নামিতেও পারিবে না। সুতরাং অচল থাকিয়াই উহার সাম্যাবস্থা থাকিবে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘোটক যদি শকটকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে টানে তাহা হইলে শকটের বৈষম্যাবস্থা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই শকটের বেগ বৃদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থা ঘটে। আবার যদি ঘোটক শকটকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলে টানে তাহা হইলেও একবার বৈষম্য হয়। কিন্তু সেই ক্ষণে শকটের বেগ হ্রস্ব হইয়া সাম্যাবস্থা জন্মে।

অতএব সাম্যাবস্থাই যন্ত্র মাত্রের স্থায়ী ভাব। বৈষম্যাবস্থা উহাদিগের ব্যভিচারী ভাব মাত্র। এই হেতু যন্ত্রের প্রকৃতি বর্ণন করিতে হইলে উহাদিগের স্থায়ীভাব বর্ণন করিলেই হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

যন্ত্র কত প্রকার? বিশুদ্ধ-যন্ত্র কত প্রকার? যন্ত্র-মূল কি

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বকালাবধি যত প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার ছিল আর সম্প্রতি ইংরেজেরা এই দেশে যত প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ ইউরোপ খণ্ডে যত প্রকার যন্ত্র এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে. আর তথায় দিন২ যত নূতন২ যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে, সেই সকল গুলির সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। ইউরোপের অনেক দেশে এমত অনেক যন্ত্রের ব্যবহার আছে, যাহার নামও তথাকার অপর দেশীয় লোকের শ্রুতিগোচর হয় নাই।

কিন্তু যন্ত্রের প্রকার ভেদ যতই হউক না কেন তাহারা প্রথমতঃ বিশুদ্ধ এবং বিমিশ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বিশুদ্ধ-যন্ত্র গুলির প্রকৃতি এই যে, তাহাদিগের কার্য্য স্থান এবং বল-প্রয়োগ স্থান এই দুই স্থানের মধ্যে

অপর কোন যন্ত্রের কার্য্য হয় না, ঐ যন্ত্র একাকীই কার্য্য-কারী হয়। যখন্ এক খানা বাঁশে চাড়া দিয়া কাষ্ঠ বা অপর কোন ভারী দ্রব্যকে সরান যায় তখন্ ঐ বাঁশ একটা বিশুদ্ধ-যন্ত্রের কার্য্য করে। বিমিশ্র-যন্ত্রের প্রকৃতি ইহার বিপরীত। উহার অনেক ভাগ থাকে। সেই এক২ ভাগ এক২টী বিশুদ্ধ-যন্ত্র। উহারা প্রথমতঃ পরস্পরের প্রতি কার্য্যকারী হইয়া পরিশেষে অভিপ্রেত সাধন করে। চরকা একটী বিমিশ্র-যন্ত্র। চরকার কর্ণে পাক দিলে সেই পাকে উহার কাঠি ঘূরে, কাঠি ঘুরিলে উহার হাঁড়ি ঘুরে, সেই হাঁড়িতে যে তাঁইত বেষ্টিত থাকে তাহা হাঁড়ির সহিত ঘুরে, তদ্দ্বারা টক্রু ঘূর্ণিত হয়, পরে টক্রুর ঘুরণে তুলায় পাক লাগিয়া ক্রমশঃ সূত্র হইতে থাকে।

কোন বিমিশ্র-যন্ত্র দ্বারা কত কার্য্য হইতেছে নিরূপণ করিতে হইলে ঐ যন্ত্রটী যত গুলি বিশুদ্ধ-যন্ত্রের সংযোগে জন্মিয়াছে সেই সকল গুলির কার্য্য-ক্ষমতা পরিমাণ করিতে হয়। ঐ সকল গুলির কার্য্য-ক্ষমতা সমুদয়ে যত হয়, বিমিশ্র যন্ত্রের কার্য্য-ক্ষমতা ঠিক্ তাহারই সমষ্টি হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ-যন্ত্রের প্রকৃতি অনুসন্ধান করাই আবশ্যক বোধ হইতেছে।

বিশুদ্ধ-যন্ত্র সর্ব্ব সমেত তিন প্রকার বই নাই। যেমন্ কোন ভাষায় যতই কেন কথা থাকুক না, সেই ভাষার যয়টি বর্ণ সেই গুলি মিলিয়াই সকল কথা হয়,

যেমন জগতের পদার্থ ভেদ যতই হউক না কেন, পঞ্চ-ষষ্টি প্রকার পরমাণুর দ্বারাই সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তেমনি যে দেশে যত প্রকার যন্ত্র থাকুক না কেন, উৎ তিন প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্র ব্যতিরেকে তাহার কাহাতেও কিছু অধিক থাকে না। ঐ তিনটি যন্ত্র এই

১ অবলম্ব সমন্বিত কঠিন দণ্ড।

২. নম্য রজ্জু বা শৃঙ্খল।

৩. কঠিন এবং মসৃণ ক্রমনিম্ন ধরাতল।

ইহাদিগের প্রথমটীর প্রকৃতি এই যে, উহাকে অবলম্বের উপর চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত করা যায়। সুতরাং ঐ রূপে ঘূর্ণিত করিলে উহার সকল ভাগই বৃত্তাকার পথে ভ্রম করে, এবং যে ভাগ অবলম্ব-স্থান হইতে যত দূর তাহা বেগ তত অধিক হয়। কারণ অবলম্ব-স্থান ঐ সক বৃত্তেরই কেন্দ্র এবং অবলম্ব-স্থান হইতে যে ভাগ য দূর সে ভাগ তত বৃহদ্বৃত্ত-পরিধিতে ভ্রমণ করে।
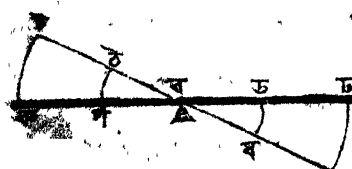
এই প্রতিকৃতি দেখিলেই বোধ হইবে যদি 'কচ' নামক দণ্ড 'ব' নামক অবলম্বের উপর ঘুরিয়া 'টছ' রেখায় যাইয়া উপস্থিত হয় তবে 'কচ'এর 'গ' 'ড' 'ক' 'চ' প্রভৃতি যে স্থান 'ব' হইতে যত দূর তাহাকে তত অধিক পথ, যথা 'গঠ' 'ঘড' 'কট' 'ছচ' এক সময়ে যাইতে হইবে। সুতরাং উহা-

দিগের দূরত্বানুসারে বেগের তারতম্য হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্র একটী রজ্জুমাত্র। উহার প্রকৃতি এই যে, উহার এক স্থানে কোন বল প্রযুক্ত হইলে তাহা সর্ব্ব স্থানে সমান লাগে। যদি ঐ রজ্জুকে কোন কঠিন দ্রব্যের উপর বেড় দিয়া লওয়া যায় তথাপি সেই প্রকৃতির অন্যথা হইতে পারে না। কারণ উহা যে, সর্ব্বতোভাবে নম্য এবং ঘর্ষণ-বিহীন ইহা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।
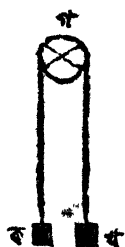
'কগঘ' নামক একটী ঐ রূপ রজ্জু। উহাকে 'গ' নামক কোন চক্রের উপর বেড় দিয়া এক প্রান্তে 'ক' এবং অপর প্রান্তে 'খ' নামক ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'ক' যত ভারী 'খ' ঠিক্ তত ভারী না হইলে ঐ রজ্জু কখন সাম্যাবস্থ থাকিবে না, যে দিকে অধিক ভার সেই দিক্ নামিয়া পড়িবে।

তৃতীয় প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্র একটা কঠিন ক্রমনিম্ন ধরাতল। উহার উপর ভারী দ্রব্যাদি গড়াইয়া, অথবা টানিয়া তুলিতে পারা যায়। সেই দ্রব্য উত্তোলন করিতে যে বল প্রযুক্ত হয় তাহাকে গতি-বিভাগের নিয়মানুসারে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হয়। পরপৃষ্ঠের চিত্রে 'কখগ' একটী ক্রমনিম্ন ধরাতল। উহার উপর 'ড' নামক
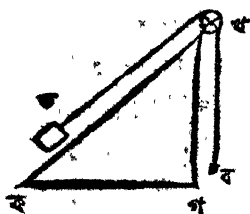
ভার উত্থিত করণার্থে উহাতে একটী রজ্জু বদ্ধ করিয়া 'খ' নামক স্থানের উপর দিয়া ঐ রজ্জু নীচে ঝুলাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং সেই প্রান্তে 'ব' নামক ভার বদ্ধ হইয়াছে। 'ব' ভার 'ড' অপেক্ষা ন্যূন। অথচ উহা দ্বারা যে, 'ড' সাম্যাবস্থ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, 'ড' নামক ভার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে 'খগ' লম্ব রেখা ক্রমে ঠিক্ নীচে আসিতে চাহে। কিন্তু ঐ বল গতি-বিভাগের নিয়মানুসারে দুইটী বলের সমান। পরন্তু ঐ দুইয়ের মধ্যে একটী 'কখ'এর উপর লম্বমান হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং তাহা ঐ কঠিন ক্রমনিম্ন ধরাতলের প্রতিঘাতেই সাম্যাবস্থ হইতেছে। অতএব ঐ দুইয়ের একটী মাত্র এই স্থলে কার্য্যকারী হয়। যদি সেই বলটী 'ব'এর আকর্ষণ পাইয়া সাম্যাবস্থ হয়, তবে সুতরাং 'ড' ভার স্থির হইয়া থাকে। উপরে বা নীচে কোন দিকেই যাইতে পারে না। ক্রমনিম্ন ধরাতলে যেরূপ গতি-বিভাগ হইয়া থাকে তাহা প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে ১৫৩ পৃষ্ঠের চিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে সুস্পষ্ট বোধ হইবে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বিশুদ্ধ-যন্ত্র এই তিন প্রকার বই আর নাই, কিন্তু যন্ত্র-বিজ্ঞান বেত্তারা পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থ নিমিত্ত ঐ তিনেরই প্রকার ভেদ করিয়া স্বতন্ত্র হয়

প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্র কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ রূপ কল্পনা করা আবশ্যক হয় তবে, ছয় প্রকার না বলিয়া বিশুদ্ধ-যন্ত্র আট প্রকার বলাই অধিক যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হইতেছে। সেই আট প্রকারকে যন্ত্র-মুল বলা যায়। তাহাদিগের এক২টীর বিশেষ২ নাম এই।

১. সরল-দণ্ড-যন্ত্র। ৫. অবদ্ধ-কপি-যন্ত্র।
২. বক্র-দণ্ড-যন্ত্রে। ৬. ক্রমনিম্ন-ধরাতল-যন্ত্র।
৩. অক্ষ-চক্র-যন্ত্র। ৭. কাজলা বা ছেনি যন্ত্র।
৪. বদ্ধ-কপি-যন্ত্র। ৮. স্ক্রু-যন্ত্র।

এই আটটীর মধ্যে ১ম ২য় ও ৩য় সর্ব্ব প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ-যন্ত্রের প্রকার বিশেষ মাত্র—৪র্থ এবং ৫ম দ্বিতীয় প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্রের অন্তর্গত আর ৬ষ্ঠ ৭ম ও ৮ম তৃতীয়ের অন্তর্ভূত।

যাঁহারা যন্ত্র-মুল ছয়টী বলেন তাঁহারা ২য় কে প্রথমের অভিন্ন এবং ৪র্থ ও ৫ম দুইকেই এক বোধ করেন।

এই সমস্ত যন্ত্র-মুলের প্রকৃতি ক্রমশঃ কথিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

[সরল দণ্ডযন্ত্র—তুলা-দণ্ড—উদাহরণ—অবলম্বের উপর চাপ।]

একটা কঠিন এবং দীর্ঘাকার দণ্ড যদি কোন অবলম্বের উপর ঘুরে তাহা হইলেই দণ্ড-যন্ত্র হয়। দণ্ড-যন্ত্রের তিন অঙ্গ—একটী অবলম্ব এবং দুইটী ভুজ। যাহার উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড ঘূর্ণিত হয় তাহার নাম অবলম্ব, এবং ঐ অবলম্ব হইতে প্রয়োগ-স্থানের দূর-

ত্বকে একটী ভুজ এবং কার্য্য স্থানের দূরত্বকে আর একটী ভুজ বলা যায়। অবলম্বের, কার্য্য-স্থানের ও প্রয়োগ-স্থানের বিভিন্ন প্রকার বিনিবেশ হইতে পারে। কোন২ দণ্ড-যন্ত্রে অবলম্ব-স্থান মধ্যে এবং কার্য্য ও প্রয়োগ-স্থান উক্ত অবলম্বের দুই দিকে হয়। ঐ দণ্ড-যন্ত্রকে অবলম্ব-মধ্যক কহে। কোন২ দণ্ড-যন্ত্রের কার্য্য-স্থান মধ্য ভাগে এবং অবলম্ব ও প্রয়োগ-স্থান দুই প্রান্তে হয়। তাদৃশ দণ্ড যন্ত্রকে ভার-মধ্যক বলা যায়। আর কোন২ দণ্ড-যন্ত্রের প্রয়োগ-স্থান মধ্যে ও কার্য্য-স্থান এবং অবলম্ব উভয় পার্শ্বে থাকে। সেই সকল দণ্ড-যন্ত্রের নাম বল-মধ্যক। এই প্রতিকৃতিতে 'ক অ প' একটী কঠিন দণ্ড। 'অ' উহার অবলম্ব 'ক' কার্য্য-স্থান এবং 'প' প্রয়োগ-স্থান, 'ভ' ভার এবং 'ব' বল। এই স্থলে 'ক' এবং 'প' উভয়ের মধ্যভাগে 'অ' রহিয়াছে—অতএব ইহা প্রথম প্রকার অর্থাৎ অবলম্ব-মধ্যক-দণ্ড-যন্ত্র হইল।
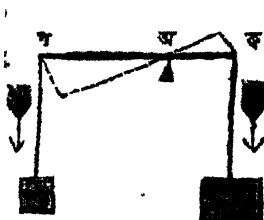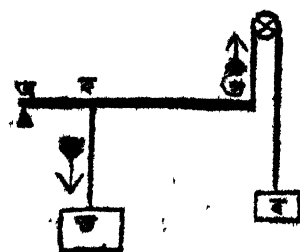
এই দ্বিতীয় প্রতিকৃতিতে ভার-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের আকার দৃষ্ট হইতেছে।
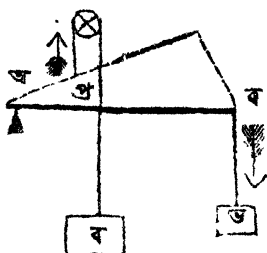
তৃতীয় চিত্রটী বল-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের প্রতিকৃতি।

দণ্ড-যন্ত্র যে প্রকার হউক না কেন, উহার সাম্যাবস্থায় ভারের এবং বলের বেগ-বল সমান থাকা আবশ্যক। অতএব অবলম্ব-স্থান হইতে বলের দূরত্বকে বলের গুরুত্ব দ্বারা পূরণ কর এবং ভারের দূরত্বকে ভারের গুরুত্ব দ্বারা পূরণ কর, যদি ঐ দুই গুণ-ফল সমান হয় তাহা হইলেই সাম্যাবস্থা জানিতে পারিবে।

পূর্ব্বগত তিনটী চিত্রের প্রথমটীর 'অপ' ভুজ যদি ৬ হাত এবং 'অক' ভুজ ২ হাত দীর্ঘ হয় আর 'ক' স্থলে বদ্ধ হইয়া যে 'ভ' নামক ভার ঝুলিতেছে সে যদি ১২ সের পরিমিত হয় তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই স্থলে ভারের উন্নতি বা বেগ 'অক' দ্বারা এবং বলের পতন বা বেগ 'অপ' দ্বারা পরিমিত হইতে পারে। কারণ উহাদিগের গতি যে বৃত্ত পরিধিতে হইবে সেই বৃত্তের একটীর ব্যাসার্দ্ধ 'অক' এবং অপরটীর 'অপ'। অতএব এই স্থলে সাম্যাবস্থার নিয়ম এইরূপ হইতেছে, যথা—ভা × অকা = ব × অপ্র।

পরন্তু 'অক' ২ হাত এবং 'অপ' ৬ হাত, আর ভার ১২ সের, সুতরাং ১২ × ২ = ৬ × ব

$\therefore$ ব = $\frac{১২ × ২}{৬}$ = ৪ সের

অর্থাৎ 'ব' /৪ সের পরিমিত হইলেই ঐ যন্ত্র সাম্যাবস্থ থাকিবে। দেখ, এই স্থলে বেগের ক্ষতি হইয়া বলের লাভ হইল, কারণ উপরিস্থ সমীকরণের প্রথমাংশে বেগ ২. এবং শেষে ৬; সুতরাং বল লাভ হইয়াছে বেগ অধিক যাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রতিকৃতিতে যদি এমত কল্পনা করা যায় যে, 'অকা' ২ হাত 'অপ্র' ৬ হাত এবং 'ভা' ১২ সের তাহা-হইলেও

$$অকা \times ভা = অপ্র \times ব =$$

$$২ \times ১২ = ৬ \times ব$$

$$\therefore ব = \frac{২ \times ১২}{৬} = ৪.$$

এস্থলেও বেগের ক্ষতি হইয়া বলের লাভ হইতেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রতিকৃতিতে যদি 'অপ্র' ২ হাত এবং 'অকা' ৬ হাত আর 'ভা' ১২ সের হয় তবে

$$অপ্র \times ব = অকা \times ভা =$$

$$২ \times ব = ৬ \times ১২$$

$$\therefore ব = \frac{৬ \times ১২}{২} = ৩৬: সের।$$

এই স্থলে ৩৬ সের বলে ১২ সের ভার সাম্যাবস্থ হয়; অতএব বলের অনেক ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু বলের যত ক্ষতি হইতেছে বেগের ঠিক্ তদনুসারেই লাভ হই-তেছে। ঐ প্রতিকৃতি দেখিলেই বোধ হইবে যে, 'প্র' আকৃষ্ট হইয়া যে সময়ে উহার উপরিস্থ রেখার উপর উপস্থিত হয়, সেই কালের মধ্যে 'কা'ও তাহার উপরি

রেখায় যাইয়া পৌঁছে। কিন্তু 'গ্র' যে বিন্দুতে পৌঁছিয়া যত স্থান যাইতেছে তাহা অপেক্ষা 'ক' যে বিন্দুতে পৌঁছিয়া যত স্থান যাইতেছে তাহা তিন গুণ অধিক, অতএব যেমন ১২, সের ভারকে উত্তোলন করিতে তাহার তিন গুণ অধিক বল, অর্থাৎ ৩৬ সের বল দিতে হইয়াছে, তেমনি বেগেও তিন গুণ লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ বল ১ হাত মাত্র নামিয়া ভারকে ৩ হাত উত্তোলিত করিয়াছে।

অতএব নিশ্চিত হইল যে, অবলম্ব-স্থান হইতে বলের দূরত্ব যত অধিক এবং ভারের দূরত্ব যত অল্প হয় ততই বলের লাভ এবং বেগের ক্ষতি হয়, আর বলের দূরত্ব যত অল্প এবং ভারের দূরত্ব অধিক হয় ততই বলের ক্ষতি এবং বেগের লাভ হইয়া থাকে। যদি বলের এবং ভারের দূরত্ব সমান হয় তবে লাভ লোক্সান কিছুই হয় না। এক দিকে যত ভার দেওয়া যায় অপর দিকে ঠিক্ তাহার সমান বল দিতে হয়, নচেৎ যন্ত্র সাম্যাবস্থ থাকে না। নিক্তি এই রূপ সম-ভুজ-দণ্ড-যন্ত্র। উহার মধ্যে অবলম্ব এবং দুই দিকের দুই ভুজ সমান। সুতরাং এক দিকে যত ভার দেওয়া যায় অপর দিকে ঠিক্ তত ভার না দিলে ঐ যন্ত্র সাম্যাবস্থ হয় না; যে দিক্ ভারী সেই দিক্ ঝুলিয়া পড়ে।

অতএব নিক্তি মাত্রেরই দুই ভুজ সমান ভারী এবং সমান দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই ওজন ঠিক্ হইতে পারে। পরন্তু যদি তাহা না হয়, তথাপি একবার

এক পাল্লায় এবং দ্বিতীয় বার অপর পাল্লায় রাখিয়া দ্রব্যাদি পরিমাণ করিয়ালইলেও ঠিক্ ওজন পাওয়া যায়। লোকে যখন্ একেবারে অধিক দ্রব্য ক্রয় করে তখন্ প্রায়ই ঐ রূপে 'পাল্লা-বদল' করিয়া লয়। কিন্তু যদি অল্প দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় তখন্ পুনঃ২ ওজন করিতে হয় না বলিয়া প্রথমে নিক্তির দুই দিক্ সমান ভারী আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং যে দিক্ লঘু বোধ হয় সেই দিকে অপর কোন ভার দিয়া, অর্থাৎ 'পাষাণ ভাঙ্গিয়া' উভয় দিক্ সমান করিয়া লয়। কিন্তু 'পাষাণ ভাঙ্গা' অপেক্ষা একটা আরও উত্তম উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিলে অতি নিকৃষ্ট তুলা-দণ্ড দ্বারাও পরিমাণ ঠিক্ হইতে পারে। প্রথমে যে দ্রব্যের ওজন করিবে তাহা এক পাল্লায় রাখিয়া অপর পাল্লায় বালুকা ইষ্টক বা যাহা কিছু দিয়া দুই দিক্ সমান করিয়া লইবে, পরে ঐ দ্রব্যকে নামাইয়া সেই পাল্লায় বাটখারা তুলিয়া দিবে। যে পরিমাণ বাটখারা তুলিলে অপর পাল্লার ইষ্টকাদির ঠিক্ সমান হইবে তাহাই ঐ দ্রব্যের পরিমাণ। তুলা-দণ্ড যেমন হউক না কেন, যদি বাটখারা ঠিক্ থাকে তবে এইরূপ করিলে অবশ্য প্রকৃত পরিমাণ জানা যাইবে।

দণ্ড-যন্ত্রের ভুজ দ্বয় সমান না হইলেও ঐ যন্ত্রের প্রকৃতি জানা থাকিলে তদ্দ্বারা দ্রব্যাদির ভার পরিমাণ হইতে পারে। পরবর্ত্তী চিত্রে 'কখ' দণ্ডের যদি অবলম্ব স্থান
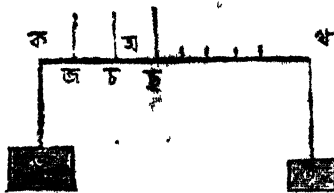
'অ' ছুয় এবং 'অক' ভুজ ৪ অঙ্গুলি আর 'অখ' ভুজ ২০ অঙ্গুলি প্রমাণ হয় তবে, 'খ' হইতে 'ব' নামক /২সের ভার ঝুলাইয়া দিলে 'ক' হইতে ($\frac{২০\times২}{৪}$) = ১০সের ভার ঝুলাইতে হইবে, নচেৎ দণ্ড সাম্যাবস্থ থাকিবে না। সুতরাং যদি এই দণ্ডে 'ব' এবং 'ভ' সাম্যাবস্থ থাকে তবে 'ব' কত জানিলেই 'ভ' কত আছে জানিতে পারা যায়, অতএব ইহা দ্বারাও ভার নিশ্চয় হইতে পারে।

কিন্তু যদি এইরূপ না হইয়া 'ব' সর্ব্বদা সমান থাকে আর 'অ'কে যথা ইচ্ছা সরাইতে পারা যায় তাহা হইলেও পরিমাণ হয়। কারণ দেখ যদি অবলম্ব 'অ' হইতে 'ছ' স্থানে সরিয়া আইসে এবং 'অছ' দুই অঙ্গুল প্রমাণ হয় তবে এই স্থলে ভারের দূরত্ব ৬ অঙ্গুল এবং বলের দূরত্ব ১৮ অঙ্গুল হইবে। সুতরাং 'ব' /২ সের হইলে 'ভ'($\frac{১৮\times২}{৬}$) = ৬ সের হওয়া আবশ্যক। যদি অবলম্ব স্থান আরও 'খ'এর দিকে দুই অঙ্গুল আসিয়া উপস্থিত হয় তবে, ভারের দূরত্ব ৮ অঙ্গুল এবং বলের দূরত্ব ১৬ অঙ্গুল হইবে। সুতরাং 'ব' যদি সেই /২ সের থাকে তবে 'ভ'($\frac{১৬\times২}{৮}$) = /৪ সের পরিমিত হইবে। পরন্তু যদি অবলম্ব স্থান 'ক'এর দিকে দুই অঙ্গুল প্রমাণ গিয়া 'জ' স্থানে উপস্থিত হয় তবে, 'ভ'এর দূরত্ব ২ অঙ্গুল

এবং 'ব'এর দূরত্ব ২২ অঙ্গুল হইয়া উঠে। সুতরাং 'ব' পূর্ব্ববৎ /২ সের থাকিলে 'ড'$(\frac{২২\times২}{২})$= ২২ সের হওয়া আবশ্যক।

এই রূপ তুলাদণ্ডের লাভ এই যে, অনেক বাটখারা লইয়া বেড়াইতে হয় না। আর যদি 'ব'কে স্বতন্ত্র না রাখিয়া 'খ'এর সহিত যুড়িয়া দেওয়া যায় অথবা ঐ দণ্ডের 'খ' স্থান কিঞ্চিৎ স্থূল করা যায় তাহা হইলে 'ব'কেও ঝুলাইয়া দিবার আবশ্যকতা থাকে না।

আমাদিগের দেশে অতি প্রাচীন কালাবধি যে তুলদাঁড়ির ব্যবহার হইত তাহার প্রকৃতি অবিকল এই রূপ।

যখন্ কাষ্ঠের কুন্দার নীচে যষ্টি প্রবিষ্ট করিয়া এবং সেই যষ্টির নীচে এক খানি প্রস্তর বা ইষ্টক রাখিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া চাপ দেওয়া যায়, তখন্ এই প্রকার বিষম ভুজ অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রেরই ব্যবহার হয়। কাঁচি দুইটী অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের যোগে জন্মে। কাঁচির খিল ঐ দুইটী যন্ত্রের অবলম্ব স্থান, হাত দিয়া যে চাপ দেওয়া যায় তাহাই বল এবং উহাতে যে দ্রব্য কাটা যায় তাহার প্রতিবন্ধকতা ভার। ঢেঁকিও একটী অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্র। উহার পোয়া অবলম্ব, মনুষ্যের পায়ের চাপ বল এবং ধান্যাদির খোলার সংযোগ ভার।

এই রূপ অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের উদাহরণ স্থল শতং আছে। ভার-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের একটী উদাহরণ যাঁতি। যাঁতির এক প্রান্তে যে খিল থাকে তাহাই অবলম্ব, উহার মধ্যে যে গুবাকাদি দ্রব্য থাকে তাহাই ভার, এবং অপর প্রান্তে যে চাপ দেওয়া যায় তাহা বল। ভারমধ্যক-দণ্ডের আর একটী উদাহরণ নৌকার দাঁড়। দাঁড়ের মুখে জলের যে প্রতিঘাত হয় তাহা অবলম্ব, দাঁড়ের মধ্য ভাগে যে নৌকা বদ্ধ থাকে তাহা ভার এবং দাঁড়ের অপর প্রান্তে মনুষ্য কর্ত্তৃক যে আকর্ষণ প্রদত্ত হয় তাহাই বল। হাইল্‌ও এইরূপ দণ্ড-যন্ত্র। কবাটও এইরূপ। কবাট যে কব্‌জা বা হাঁস্‌কলে ঝুলান থাকে তাহাই উহার অবলম্ব, উহার ভার মধ্যে থাকে এবং অপর প্রান্তে যখন্‌ হাত দিয়া ঠেলা যায় তখন্‌ হস্তের 'বল' প্রযুক্ত হয়। হাত-গাড়িরও মধ্যে ভার এক পার্শ্বের চক্র অবলম্ব এবং অন্য প্রান্তের মনুষ্যের হস্ত বল। বগি গাড়ি প্রভৃতি যত দ্বিচক্র শকট আছে সকলই এই রূপ। মই দিয়া যখন্‌ উপরে উঠা যায় তখন্‌ যে উঠে তাহার ভার উক্ত মইএর মধ্যে থাকে, নীচে মৃত্তিকা অবলম্ব হয় এবং যাহাতে মই ঠেকিয়া থাকে, সেই প্রাচীরাদি বলের কার্য্য করে। বেহারাদিগের স্কন্ধের পালকিকেও এইরূপ দণ্ড-যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কারণ উহাতেও ভার-মধ্যে থাকে এবং এক পার্শ্বের বেহারাদিগের স্কন্ধ অবলম্বের কার্য্য করে ও অপর পার্শ্বে বেহারাদিগের স্কন্ধ বলের কার্য্য করে।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার দণ্ড যন্ত্রের উদাহরণ যত অধিক পাওয়া যায় বল-মধ্যক দণ্ড যন্ত্রের উদাহরণ তত পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই প্রকার দণ্ড যন্ত্রের আশ্রয়ে বল ব্যয় করিয়া বেগ লাভ হয়। অতএব যে স্থলে বেগের প্রয়োজন সেই স্থলেই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাণীদিগের সর্ব্বদা নানাস্থানে বিচরণ করা আবশ্যক, সুতরাং তাহাদিগের শরীরে বেগের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। এই হেতু জগদীশ্বর তাহাদিগের অনেক অঙ্গে এইরূপ বল-মধ্যক দণ্ড যন্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছেন। মনুষ্যের হস্ত পদ তাহার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদের হাতের কনুই অবলম্ব, সেই কনুইর নীচে যে মাংসপেশী আছে তাহারই সঙ্কোচ্যতা এবং বিস্তার্য্যতা বল, এবং হাতে করিয়া যাহা তুলা যায় বা ফেলা যায় তাহাই ভার। দেখ, যখন্ আমরা হাত গুড়াইয়া লই, তখন্ ক ফোণির সন্নিহিত ভাগ অতি অল্প মাত্র সরে, কিন্তু তাহাতেই হস্তের অগ্রভাগ অনেক দূর সরিয়া যায়। অতএব ঐ স্থলে বেগের লাভ হইতেছে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। পায়েও ঠিক্ ঐরূপ হয়। হাঁটু অবলম্ব তাহার নীচের মাংস পেশী [illegible] ঐ মাংসপেশী অতি অল্প মাত্র সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত [illegible] পায়ের অগ্রভাগ অনেক দূর সরে।

[illegible] যন্ত্রের অবলম্বের উপর কিরূপে কত চাপ পড়ে [illegible] আবশ্যক। অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের ভার এবং বল

উভয়েই দণ্ডটীকে এক দিকে আকর্ষণ করে, সুতরাং দণ্ড সাম্যাবস্থ থাকিলে ঐ দুইয়ের চাপ মিলিত হইয়া যে, অবলম্বের উপর পড়িবে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

[২০ পৃষ্ঠের প্রথম প্রতিকৃতিতে যে দিকে শরের মুখ সেই দিকে চাপ বুঝিতে হইবে।]

ভার-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রে বল এবং ভার উভয়ে একাভিমুখে চাপ দেয় না। যদি বল, নীচের দিকে যায় তবে ভার উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করে। অতএব এই স্থলে ঐ দুই চাপের পরস্পর বিভিন্নতা বা ব্যবকলন-ফল যত অবলম্বের উপরে তত চাপ পড়িয়া থাকে [২০ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় প্রতিকৃতিতে ইহা সপ্রমাণ করিয়া লও।]

যদি 'ভ' ১২ সের এবং 'অব' ২ হাত আর 'অ' ৬ হাত হয় তবে 'ব' $(\frac{১২\times২}{৬})$=/৪ সের হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সাম্যাবস্থায় 'অ'এর উপর (ভা—ব=১২—৪=) ৮ সের ভার পড়ে।

যখন্ দুই জন মুটে কোন ভারী দ্রব্য বাঁশে বান্ধিয়া লইয়া যায়, তখন্ তাহারা ঐ ভার ঠিক মধ্য স্থলে বান্ধে। নচেৎ যাহার নিকট হয় তাহাকে অধিক ভার সহ্য করিতে হয়।

বল-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রেও ঠিক্ এই রূপ বিবেচনা করিলেই ভারের এবং বলের ব্যবকলন-ফল যে অবলম্বের উপরের চাপ হইবে ইহা নিশ্চয় বোধ হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[বক্র দণ্ড-যন্ত্র—মিশ্র দণ্ড-যন্ত্র—উদাহরণ।]

যদি দণ্ড-যন্ত্র ঠিক্ সরল না হয় তাহা হইলেও উহার পূর্ব্ব প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু উহার ভারের এবং বলের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণার্থে অবলম্ব হইতে উহাদিগের দূরত্ব যত তাহা কিঞ্চিদ্বিবেচনা করিয়া বুঝা আবশ্যক।
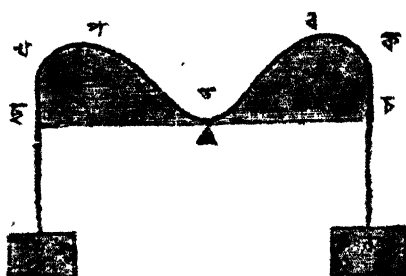
'কখ' নামক এক খানি বক্র কাষ্ঠখণ্ড 'অ' নামক আলম্বের উপর অবস্থিত আছে। যদি 'ক' এবং 'খ' হইতে দুই দিকে দুইটী ভার ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ ভার দ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি রূপ হইবে? ইহা জিজ্ঞাস্য হইলে এই স্থলে প্রথমতঃ বিবেচনা কর যেন, ঐ কাষ্ঠের উপরিভাগ ক্রমশঃ চাঁছিয়া ফেলা গেল। উহাতে কুব্জাকার যে 'প' এবং 'ব' ভাগ ছিল তাহা আর রহিল না। সুতরাং ঐ বক্র কাষ্ঠ খণ্ড 'ছতচ'এর অনুরূপ একটী সরল দণ্ড-যন্ত্র হইল। এইক্ষণে সরল দণ্ডের যে প্রকৃতি

ইহারও সেই প্রকৃতি হইল। অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় তছ×ভা=তচ×ব হইল। সকল বক্র দণ্ডেরই এইরূপ। বলের এবং ভারের যেং দিকে কার্য্য হইতেছে অবলম্ব স্থান হইতে তাহার উপর লম্বপাত করিতে হয়। এবং সেই লম্বদ্বয়ের পরিমাণ করিয়া লইলেই ভারের এবং বলের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়।

যদি কোন দণ্ড-যন্ত্রের প্রতি এমত রূপে ভার এবং বল প্রযুক্ত হয় যে, তাহাদিগের প্রযোগাভিমুখ পরস্পর সমান না থাকে, তাহা হইলে গতি-সংঘাত এবং গতি-বিভাগের সূত্র স্মরণ করিয়া ভার এবং বলের সম্বন্ধ নিশ্চয় করা আবশ্যক।
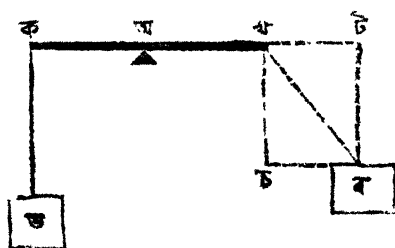
এই প্রতিকৃতিতে 'ভ' নামক ভার 'ক' হইতে লম্ব রেখায় ঝুলিতেছে, কিন্তু 'ব' নামক বল 'খব' নামক বক্র রেখানুসারে আকর্ষণ করিতেছে, এই স্থলে কিরূপ কার্য্য হইতেছে বিবেচনা করিতে হইলে ঐ 'খব' বলকে দুই ভাগে বিভাগ করিতে হয়। ঐ বিভক্ত বলদ্বয়ের এক ভাগ 'কভ'র সমান্তরাল এবং সমান হইবে যেহেতু ঐ বল দ্বারাই উক্ত ভার সাম্যাবস্থ

হইতে পারে। সেই ভাগ যেন 'খচ'। তাহা হইলেই অপর ভাগ 'খট' হইবে, অতএব বোধ হইতেছে যে, ঐ বল-ভাগ সমুদায় যন্ত্রকে 'খট' অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং তদ্দ্বারা অবলম্বের উপর পার্শ্বে টান পড়িতেছে।

অনেক গুলি দণ্ড-যন্ত্রকে একত্রে মিলিত করিলে, বিমিশ্র দণ্ড-যন্ত্র হয়। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে 'কখ' 'খগ' 'গঘ' 'ঘচ', এবং 'চছ' এই পাঁচটী দণ্ড-যন্ত্র এমত রূপে সন্নিবেশিত হইয়া আছে, যে 'ব' দ্বারা প্রথম দণ্ডের 'ক' স্থান নত হইলে যেমন 'খ' উন্নত হয়, তেমনি তৎসহ যোগে দ্বিতীয় দণ্ডের ঐ 'খ' ভাগ উন্নত হওয়াতে 'গ' নত হইয়া পড়ে এবং 'গ' নত হইলেই 'ঘ' উত্থিত হয় আর 'ঘ'এর উত্থানে 'চ'এর অবনতি ও তৎসহ যোগে 'ছ'এর উন্নতি হইয়া থাকে। এস্থলে বিবেচনা কর। আবশ্যক যদি সমুদয় দণ্ড গুলির অবলম্বের বাম ভাগস্থ প্রত্যেক ভুজগুলি ১০ অঙ্গুলি পরিমিত হয়, আর দক্ষিণ ভাগস্থ ভুজগুলি প্রত্যেকে দুই অঙ্গুলি করিয়া হয়, তবে 'ক' স্থানে 'ব'/১ সের পরিমিত হইলে 'খ' স্থানে উহার বল $\left(\frac{১\times১০}{২}\right)$ = /৫ সের হইবে: 'খ' স্থানে /৫ সের হইলে উহা 'গ' স্থানে $\left(\frac{৫\times১০}{২}\right)$ = ২৫ সের হইবে, আবার 'গ' স্থানের ২৫ সের বল 'ঘ' স্থানে $\left(\frac{২৫\times১০}{২}\right)$ = ১২৫ সের
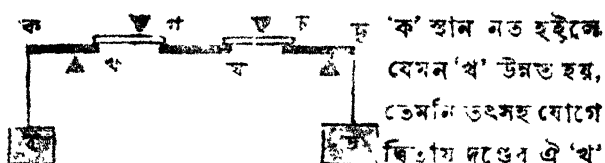
হইবে, 'ঘ' এখ ১২৫ 'চ' স্থানে ৬২৫ আর এ ৬২৫ 'ছ' স্থানে ৩১২৫ হইবে। অথবা ক্রিয়া লাঘব করিবার নিমিত্ত ঐ অঙ্ক এমত করিয়া কসিলেও হইতে পারে; যথা, $\frac{১\times১০\times১০\times১০\times১০}{২\times২\times২\times২\times২}\times১০=১\times৫\times৫\times৫\times৫\times৫=৩১২৫$ সের। যদি ঐ সকল ভুজ প্রত্যেকেই দশ অঙ্গুলি এবং দুই অঙ্গুলি না হইয়া পরস্পর বিভিন্ন হয়, তাহা হইলেও এই নিয়মানুসারে [illegible]ের ফল স্থির হইতে পারে। মিশ্র দণ্ড-যন্ত্রের গুণ এই যে, উহা দ্বারা অল্প স্থানের মধ্যে অধিক বলের কার্য্য করা যায়। একটী বিশুদ্ধ দণ্ড-যন্ত্র দ্বারা অধিক বল লাভ করিতে গেলে, দণ্ডকে অত্যন্ত বৃহৎ করিতে হয়, সুতরাং তাহার নিমিত্ত সুদীর্ঘ স্থান করিবার আবশ্যকতা হয়, কিন্তু বিমিশ্র দণ্ড গুলিকে উপরে নীচে পার্শ্বে নানা প্রকারে বাঁকাইয়া রাখা যায়। সুতরাং অল্প স্থানে ইউহাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতি গুরুভার দ্রব্য সকল অনায়াসে ওজন করিবার জন্য রেইলওয়ে আফিসে যে তুলাযন্ত্র থাকে তাহা কেবল একটী মিশ্র দণ্ড-যন্ত্র মাত্র।
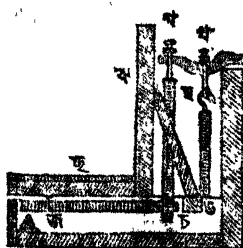
'ছ'এর উপরে কোন ভার স্থাপিত করিলে, যে চাপ পড়ে তাহার কতক 'জ'এর ঊর্দ্ধবর্ত্তী ক্ষুদ্র অবলম্ব দ্বারা 'জচ' দণ্ডের উপর পতিত হয়। তদ্দ্বারা 'জচ' কিঞ্চিন্নত হইলেই 'গচ' দণ্ড দ্বারা 'গ

স্থানে টান পড়ে। আবার ঐ ভারের কতক চাপে 'ঝ' স্থান নত হয়, তদ্দ্বারা 'ঝঙ' নামিয়া আসিবার চেষ্টা করে এবং সেই বলে 'ঙ' অবনত হয়। সুতরাং সেই চাপও 'ঙ' 'ঘখ' দণ্ড দ্বারা গিয়া 'গখক' নামক দণ্ডে উপস্থিত হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, 'ছ' স্থানে যে চাপ পড়ে তাহা 'জ' স্থানে এবং তথা হইতে 'চ' ও 'গ' স্থানে অনেক ন্যূন হইয়া যায়। আর 'ঝ' স্থানে যে চাপ পড়ে তাহাও ন্যূন হইয়া 'গখক' দণ্ডে কার্যকারী হয়। এই রূপে 'ছ' স্থানের চাপ কত ন্যূন হইয়া আসিয়াছে জানা থাকে। অতএব যে বলের দ্বারা যন্ত্রের সাম্যাবস্থা হয় তাহার পরিমাণ করিয়া তাহাতে তত বৃদ্ধি করিয়া লইলেই প্রকৃত পরিমাণ জানা যাইতে পারে।

বিমিশ্র দণ্ড-যন্ত্রের আর একটী ব্যবহার মুদ্রা যন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রা-যন্ত্রে একেবারে অধিক চাপের আবশ্যক। অথচ ঐ যন্ত্র যত সংকীর্ণ স্থান ব্যাপক হয় ততই উত্তম।
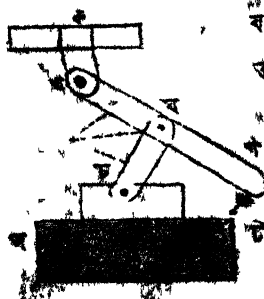
'ক' নামক এক খানি কাষ্ঠ স্বস্থানে বদ্ধ আছে, উহা কোন দিকেই সরে না। ঐ কাষ্ঠ খণ্ডে 'খগ' নামক একটী দণ্ড কীলক দ্বারা এমত রূপে বদ্ধ

আছে যে, তাহাকে 'গ' স্থান ধরিয়া টানিলে ঐ কীলকের উপর ঘুরিয়া আইসে। 'খগ' দণ্ডের মধ্য ভাগে 'খ' নামক আর একটী কীলক দ্বারা 'ঘচ' নামক আর একটী দণ্ড সংযুক্ত আছে, ঐ দণ্ডের অপর প্রান্তে 'চ' নামক কীলক দ্বারা একটী কঠিন এবং মসৃণ তাম্র বা লৌহ ফলক আছে। 'গ' স্থান ধরিয়া শরাভিমুখে আকর্ষণ করিলে 'খ' সম্মুখের দিগে ঋজুভাবে সরিয়া যায় সুতরাং 'চঘ' দণ্ড ক্রমশঃ লম্বমান হইয়া উঠিতে থাকে, তাহা হইলেই উহার চাপ উপরে 'ক'এর দিকে এবং নীচে 'চ'এর অভিমুখে হয়। কিন্তু 'ক' স্বস্থানে বদ্ধ, সুতরাং কিছু মাত্র সরিতে পারে না, অতএব উহার প্রতিঘাতও 'চ'এর উপর লম্বরেখাক্রমে হয়। তাহাতে 'চ' স্থানে বদ্ধ যে ধাতু ফলক আছে তাহা অত্যন্ত বলে নীচে সরিয়া যায়। উৎকৃষ্ট মুদ্রা যন্ত্র সকলে এই রূপ মিশ্র দণ্ডের ব্যবহার হয়। ইহাতে যে কেমন শীঘ্র কত অধিক চাপ পড়ে তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

[কপিকল—বদ্ধ-কপি—অবদ্ধ-কপি—কপি-সংহতি।]

১। যদি রজ্জু শৃঙ্খলাদি দ্রব্য সমুদায় সর্ব্বতোভাবে নম্য এবং ঘর্ষণ বিহীন হইত তবে এক্ষণে কপি-কলে যে প্রকার একটী২ চক্র দেখা যায় তাহা দিবার আবশ্যক হইত

না। যে কোন প্রকার দ্রব্য হউক [illegible]কে তাহাতে বেড় দিয়া এক পার্শ্বে ধরিয়া টানিলেই অন্য পার্শ্বে টান পড়িত অর্থাৎ তাহা হইলে 'ক'এর ন্যায় সূক্ষ্ম বা 'ক'এর ন্যায় স্থূল মুখ কাষ্ঠাদির উপর দিয়া ও 'বগ' দড়ির যোগে বল প্রয়োগ হইতে পারিত। কিন্তু বাস্তবিক কোন রজ্জুই সর্ব্বতোভাবে নম্য এবং মসৃণ নহে। সুতরাং কপি-যন্ত্রে ঘর্ষণাদি দোষ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে রজ্জুকে একং খানি চাকার উপরে বেড় দিয়া রাখা যায়। তাহাতে কপি-যন্ত্রের আকার এই রূপ হয়। 'গ' নামক এক খানি ক্ষুদ্র চক্র, উহার ধারের মধ্য ভাগ কিঞ্চিন্নত তাহাতে রজ্জু বসিয়া যায়। এবং 'খ' হইতে টান দিলে ঐ চক্র আপন কীলকের উপর বেগে ঘুরিতে থাকে; তাহাতে রজ্জুর উপর ঘর্ষণ অধিক হইতে পায় না।
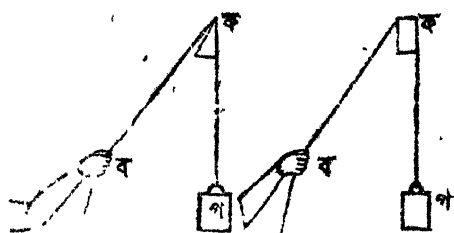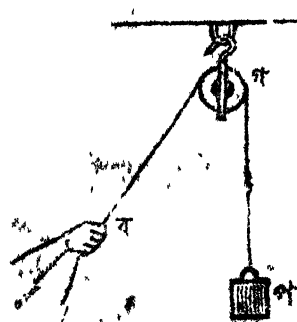
কপি-যন্ত্র দ্বারা এক দিকে বল প্রয়োগ করিয়া অন্য

কোন দিকে বল প্রয়োগ করিলে যে ফল হইতে সেই ফল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, 'ক' 'খ' দুইটী কপির যোগে বল প্রয়োগ 'ব' সন্নিহিত শরের অভিমুখে হইতেছে, কিন্তু 'ভা' নামক ভার উন্নত হইয়া উঠিতেছে।
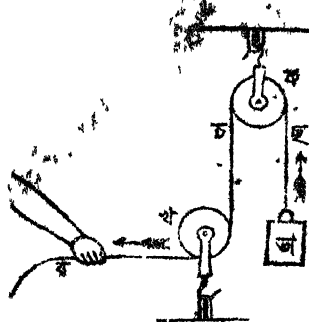
এই খানে কত বলে কত ভার উঠিতেছে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, এইরূপ কপি কলের দ্বারা বল বা বেগ কিছুরই লাভ হয় না। যত বল দ্বারা 'ব' টানিবে 'চ' স্থানেও ঠিক তত বল পড়িবে, এবং 'ছ' স্থলেও সেই বল লাগিবে। আর যদি 'ব' এক হাত সরিয়া যায় তবে 'বচছ' দড়ির অপর প্রান্ত ও এক হাত সরিবে। অতএব 'ভা'ও ঠিক সেই এক হাত উঠিবে। তবে এই প্রকার কপিকল ব্যবহার করিবার ফল এই যে, ইহা দ্বারা বল প্রয়োগের দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক কার্য্যের সুবিধা করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ইহাও সামান্য উপকার নহে। কপিকল না থাকিলে 'ভা'কে উন্নত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত 'ছক' রজ্জু দ্বারা ঊর্দ্ধ হইতে আকর্ষণ করিতে হইত। তাহাতে অনেক প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা। আর সেই রূপে বল প্রয়োগ করিতে

পদার্থাদির সামর্থ্য নাই। কিন্তু কপিকল দ্বারা দড়ি যেরূপে সংস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে 'ব' স্থলে কোন অশ্ব বা বলীবর্দ্দকে নিযুক্ত করিয়া দিলেও অনায়াসে ভার উত্থিত হইতে পারে। এইরূপ কপি স্বস্থানে বদ্ধ থাকে। বল এবং ভারের স্থানান্তর ঘটিলেও ইহার কোন দিকে গতি হয় না। এই জন্য ইহার নাম বদ্ধ কপি। আর এক প্রকার কপিকল আছে, তাহা ইহার ন্যায় বদ্ধ নাই এবং তৎকর্ত্তৃক বলের লাভ হইতে পারে। তাহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিকৃতির এক ভাগে দৃষ্ট হইবে। 'ক'টী বদ্ধ কপি, অতএব উহা কর্ত্তৃক বেগের বা বলের কিছুই সাহায্য হইতেছে না। 'খ' কপিটী অবদ্ধ আছে। তদ্দ্বারা প্রযুক্ত বলের দ্বৈগুণ্য লাভ হইতেছে। কারণ ঐ 'খ' কপিটীকে একটী দণ্ড-যন্ত্র স্বরূপ বোধ করা যাইতে পারে। সেই দণ্ড যন্ত্রের এক পার্শ্বে অর্থাৎ 'চ' স্থলে বল, 'জ' স্থানে ভার এবং 'ছ' স্থানে অবলম্ব। সুতরাং কপির চক্রটী যতই ছোট বা বড় হউকনা কেন, উহা বৃত্তাকার হইলে 'ছ' হইতে 'জ' যত দূরে আছে 'চ' তাহার অবশ্যই দ্বিগুণ দূরে হইবে। তাহা হইলেই দণ্ড যন্ত্রের নিয়মানুসারে বলের লাভও দ্বিগুণ হইবে।

পরন্তু যেমন বলের লাভ দ্বিগুণ, তেমনি বেগের অপচয়ও দ্বিগুণ হয়। কারণ স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে 'ব'

এক হাত নামিলে 'ভা' পূর্ণ এক হাত ঊর্দ্ধে উঠিবে না 'ছ'এর দিকের $\frac{1}{2}$ হাত আর 'চ'এর দিকের $\frac{1}{2}$ হাত এই দুইয়ে এক হাত দড়ি কমিবে। সুতরাং ভারের উন্নতি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইবে।

যদি কোন অবদ্ধ কপি যন্ত্রে বল এবং ভারের সন্নিবেশ ঠিক্ পরস্পর সমান্তরাল না হয়, অর্থাৎ উহারা কোণাকোণী হইয়া টানে তাহা হইলে বল ঠিক্ দ্বিগুণ লব্ধ হয় না। সেই স্থলে গতি সংঘাতের নিয়মাবলম্বন করিয়া একটী সমান্তরাল চতুর্ভুজ প্রস্তুত করত বলের এবং ভারের পরিমাণ করিতে হয়। নিম্নবর্ত্তী প্রতিকৃতিতে, যদি 'ব' /৪ সের হয় তবে 'ঘ' হইতে 'খ' স্থল পর্য্যন্ত ৪ ইঞ্চি বা অঙ্গুলি পরিমাণ করিয়া লও এবং 'ঘগ'এর দিকের টান 'ঘখ'এর দিকের সমান হয় বলিয়া 'ঘগ'কেও ঐ ৪ ইঞ্চি বা অঙ্গুলি পরিমিত কর। তাহার পর 'কখগঘ' নামক সমান্তরাল চতুর্ভুজ প্রস্তুত করিয়া, উহার 'ঘক' কর্ণরেখার পরিমাণ কর। সেই কর্ণরেখা যত অঙ্গুলীপ্রমাণ, 'ভা' নামক ভারও তত সের হইলে ঈদৃশ কপি-যন্ত্র সাম্যাবস্থ থাকিবে।

যদি ভার পরিমাণ জানা থাকে এবং কত বলে ঐ ভার সাম্যাবস্থ হইবে জানিবার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ 'ভা'

যত সের 'ঘ' হইতে উর্দ্ধদিকে তত অঙ্গুলি বা ইঞ্চি প্রমাণ একটী 'ঘক' রেখা পাত কর, পরে ঐ 'ক' হইতে দুই দিকের দুই রজ্জুর সমান্তরাল করিয়া 'কখ' এবং 'কগ' নামক দুইটী রেখা টান, 'ঘখ' বা 'ঘগ' যত অঙ্গুলি বা ইঞ্চি হইবে বল তত সের হওয়া আবশ্যক।

একটী অবদ্ধ কপিতে যে রূপ বলের লাভ হয় বলা গিয়াছে তাহা বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে একেবারে দুইটী তিনটী ঐ রূপ কপির প্রয়োগ করিতে পারিলে ততোধিক বল লাভের সম্ভাবনা। এই জন্যই অনেক স্থলে কপি-সংহতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত কতিপয়ের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা যাইতেছে।
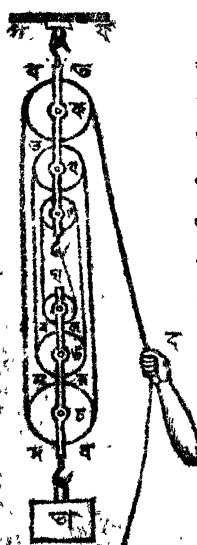
'ক' 'খ' 'গ' এই তিনটী কপিকে একত্রিত করিয়া যে কপি-সংহতি হইয়াছে তাহা 'পফ' স্থানে বদ্ধ, আর 'ঘ' 'ঙ' 'চ' নামক যে তিনটীতে মিলিয়া আর একটী কপি-সংহতি হইয়াছে তাহা অবদ্ধ। বদ্ধ তিনটীও যেমন পরস্পরে সম্বদ্ধ হইয়া এক 'ফ্রেমের' ভিতর ঘুরে অবদ্ধ তিনটীও সেই রূপ এক ফ্রেমের ভিতরে থাকিয়া ঘুরে।

বদ্ধ কপিতে বলের পূর্ব্বাবস্থাই রাখে; অতএব বল 'বঙ' রজ্জুভাগে ও যেরূপ আছে 'থদ' রজ্জু ভাগেও ঠিক সেই রূপ থাকে; কিন্তু 'ধ' স্থানে উহা দ্বিগুণ
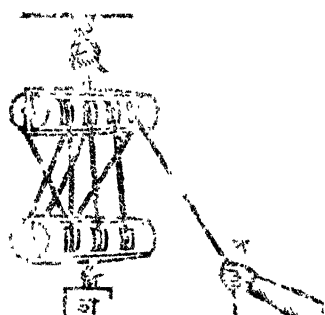
দ্বারা উত্তোলিত হয়। তাহাদের পাইপ্‌ [illegible] সংস্থাপিত করিবার সময়ে কপির অত্যন্ত প্রয়োজন।

কিন্তু কপি দ্বারা যত বল লাভ হইবে গণনা করিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়, কার্য্যে কখনই তত লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। তত কি? ঘর্ষণাদি নানা কারণে সমু-দায় বলের প্রায় তিন ভাগের ভাগ নিষ্ফল হইয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

[illegible] নিয়ম [illegible]।

১। যখন এক খানি তক্তা অথবা অন্য কোন সমতল দ্রব্যের উপর কোন ভারী বস্তু থাকে, তখন সেই দ্রব্য পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলে নিম্নগামী হইতে চাহে, কিন্তু উক্ত তক্তার প্রতিঘাত পাইয়া যাইতে পারে না সুতরাং উহার সাম্যাবস্থা থাকে; কিন্তু যদি ঐ তক্তার এক দিক্ ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলন করা যায়, তাহা হইলে উহার প্রকৃতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন ঐ ভার-মধ্য স্থলে পৃথিবীর যে আকর্ষণ পড়িতেছে তাহা পূর্ব্ববৎ লম্ব রেখাক্রমেই পড়ে কিন্তু তক্তার প্রতিঘাত ঠিক সেই রেখায় প্রতিকূল মুখে হয় না। তখন ভার পৃষ্ঠের প্রতিকূলিতে আকর্ষণ 'ঢাল' অভিমুখে এবং প্রতিঘাত
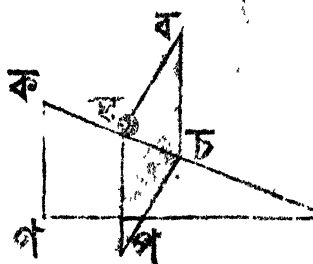
'ঘব' অভিমুখে হইতে থাকিবে। সুতরাং ঐ দুই বলের দ্বারা 'ঘ' নামক দ্রব্যের 'ঘচ' রেখা ক্রমে গতি জন্মিবে। এই স্থলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'ঘপ' যতবড় 'ঘচ' কখনই ততবড় না। অতএব 'ঘ' এর নীচে 'কখ' তক্তাটা না থাকিলে ঐ দ্রব্য যতবলে পড়িয়া যাইত, ঐ তক্তা থাকাতে তত বলে পড়িতে পারে না। সুতরাং 'ঘ' দ্রব্যের ভার অপেক্ষা অনেক অল্প ভারী কোন দ্রব্য 'ঘক' রেখায় টানিলেই 'ঘ' স্বস্থানে থাকে। অর্থাৎ উহার 'ঘচ' অভিমুখে গতি নিবারিত হয়।

অতএব বোধ হইতেছে, কোন দ্রব্যকে ঐ তক্তার ন্যায় উন্নত-নিম্ন ধরাতলের উপর ঠেলিয়া তুলিতে অথবা উহার উপর হইতে যে দ্রব্য পড়িতেছে তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে অপেক্ষাকৃত অল্প বল লাগে। ইহার উদাহরণ অনেক স্থলে সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর করা যাইতেছে। যখন গাড়োয়ানেরা কিঞ্চিদুন্নত স্থানে গাড়ি তুলিবার চেষ্টা করে তখন সহজে না পারিলে যে স্থান দিয়া গাড়ির চাকা যাইবে সেই স্থানে তক্তা পাতিয়া দেয় তাহা করিলেই গাড়ি তুলিতে পারে। যখন আমরা কোন উচ্চস্থানে উঠিবার চেষ্টা করি তখন একেবারে আপনা

দেখা যাইতেছে যে, ১২ × ব = ৪ × ১৫ ∴ ব = $\frac{৪ \times ১৫}{১২}$ = ৫ অর্থাৎ ৫ সের বলের প্রয়োজন।

কোথাও কোথাও দুইটী ক্রম-নিম্ন সমতলের কার্য্য একত্রে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই প্রতিকৃতি প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ।
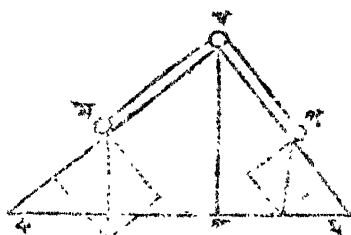
এই সকল স্থলে যেমন এক দিকে একটী ভার নামিতে থাকে, তেমনি অপর দিকের আর একটী ভার উঠিতে থাকে। 'প' এবং 'ম' এর পরিমাণ কত হইলে উহা দিগের সাম্যাবস্থা হইবে তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নীচের দ্বারা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। এই স্থলে 'ম'কে সাম্যাবস্থ করিতে $\frac{খগ}{কখ}$ × ম এত বলের প্রয়োজন হয়। আবার 'প'কে সাম্যাবস্থ রাখিতে $\frac{খগ}{খঘ}$ × প, এত বলের প্রয়োজন। অতএব $\frac{ম}{কখ}$ আর $\frac{প}{খঘ}$ সমান হইলেই সাম্যাবস্থা হইবে। যদি 'ম' ১৬ সের 'কখ' ৪ হাত এবং 'খঘ' ৮ হাত হয় তবে $\frac{১৬}{৪} = \frac{প}{৮}$ ∴ ৮ × ১৬ = ৪ × প ∴ প = $\frac{৮ \times ১৬}{৪}$ = ৩২ সের, অর্থাৎ 'ম' ১৬ সের হইলে 'প' ৩২ সের হওয়া আবশ্যক।

যদি ক্রম-নিম্ন ধরাতলের উপর কোন ভারী দ্রব্য তুলিবার সময় বল ঐ ধরাতলের সমান্তরাল রেখাক্রমে প্রযুক্ত না হইয়া অন্য কোন দিকে বক্রভাবে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে গতি-বিভাগের নিয়মানুসারে ঐ বলের ফল নিরূপণ করা আবশ্যক।
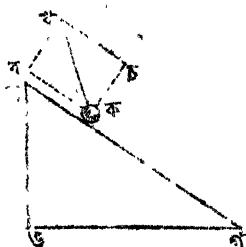
'গঘ' নামক ধরাতলের উপর 'ক' নামক একটী ভারী-দ্রব্য 'কখ' অভিমুখে তৎপরিমিত বল দ্বারা সাম্যাবস্থ হইয়া আছে। এমত স্থলে একটী 'চকরখ' নামক সমান্তরাল চতুর্ভুজ কল্পনা করিয়া উক্ত 'কখ' বলকে 'কচ' ও 'কর' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল। ঐ দুইয়ের মধ্যে 'কর' যে বল তাহা দ্বারাই দ্রব্যটী ক্রম-নিম্ন ধরাতলের উপর উঠিতে থাকিবে আর 'কচ' বলের দ্বারা ঐ ধরাতলের উপর উহাতে যে ভার পড়িতেছিল, তাহার কতক লোপ হইবে।

যদি 'কখ' বল নিম্নাভিমুখে অর্থাৎ 'খক' অভিমুখে প্রযুক্ত হয়, তবে উহাকে ভাগ করিয়া 'রক' 'চক' দুইটী বলের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'রক' দ্বারা দ্রব্য নামে আর 'চক' দ্বারা উহা ঐ ধরাতলের উপর চাপিয়া রহিবে।
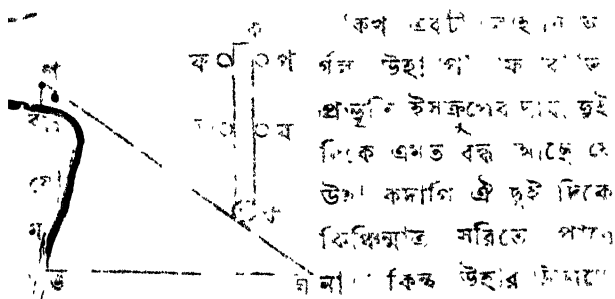
কাজ্‌লা লইয়া তাহার সূক্ষ্ম মুখের দিক্ অর্থাৎ ... দিক ঐ অর্গলের নিম্নে প্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাদিক হইতে অর্থাৎ 'গঙ'র উপর হাতুড়ির আঘাত করা যায় তবে ঐ 'গঘঙ' ক্রমশঃ 'কখ'র নীচে প্রবিষ্ট হইতে থাকে সুতরাং 'খক' উন্নত হইয়া উঠে।

সচরাচর লোকে কাজ্‌লার আকার যেরূপ করিয়া থাকে তাহাতে দুইটী ক্রম-নিম্ন ধরাতল পরস্পর তলভাগে সংযুক্ত হইলে যেরূপ হয় ঠিক সেই রূপ দেখায়।
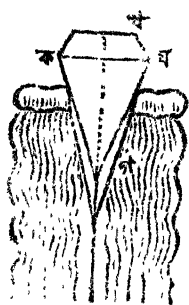
দেখ, এই 'কগঘ' নামক যে কাজ্‌লা সে কেবল 'কখগ' এবং 'ঘখগ' এই দুইটার সংযোগে জন্মিয়াছে বোধ হয়।

কাজ্‌লার ব্যবহার অনেক কর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়। কাষ্ঠ চিরিতে কাজ্‌লা বসাইয়া চিরে। ক... হাড় প্রভৃতি অতি ... সকলকে উন্নত করিতে হইলে তাহাদিগের নীচে কাজ্‌লা প্রবিষ্ট করে; কঠিন ধাতু সকলকে কাটিতে ছেনির উপর আঘাত করিয়া কাটে। ফলতঃ কর্ত্তনের যত প্রকার উপায় আছে সকলই এই যন্ত্র মূলের প্রকার-ভেদ মাত্র। ছুরী, কাটারী, ক্ষুর, সূচী, প্রেক প্রভৃতি যত যন্ত্র সকলেরই মুখ সূক্ষ্ম এবং ক্রমে স্থূল। উহারা সকলেই কাজ্‌লা।

১২½ মণ। কিন্তু যদি ঐ কুঠারকে কাষ্ঠের উপর বসাইয়া তাহার উপরিভাগে ১২½ মণ ভারী কোন দ্রব্যকে ১ হাত ঊর্দ্ধ হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় তাহাতে উক্ত কুঠার কখনই ½ হাত প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা যে কি জন্য পারে না তাহা বলা অতি কঠিন। কিন্তু এ স্থলে যে, চাপ আঘাত-বলের প্রতিনিধি হইতে পারে না তাহা স্পষ্টই দেখাইতেছে।

দশম অধ্যায়।
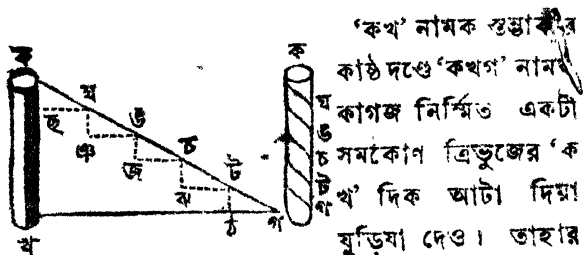
(স্ক্রু যন্ত্র।)

[স্ক্রু যন্ত্রও ক্রম-নিম্ন-ধরাতলের প্রকার ভেদ মাত্র।]

‘কখ’ নামক স্তম্ভাকার কাষ্ঠ দণ্ডে ‘কখগ’ নামক কাগজ নির্ম্মিত একটী সমকোণ ত্রিভুজের ‘কখ’ দিক আটা দিয়া যুড়িয়া দেও। তাহার

পরে ঐ কাগজ খানিকে ‘কখ’য়ের গায়ে জড়াইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, উহা ঠিক্ পার্শ্ববর্ত্তী অপর প্রতিকৃতির ন্যায় হইয়াছে। উহাই স্ক্রু-যন্ত্রের প্রতিরূপ। এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে সমুদায় কাগজ নির্ম্মিত নততলটা সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া স্তম্ভের গায়ে পাঁচটী সূত্রাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই সূত্রের একেক পাক ‘কখ’ ‘খঙ’ ‘ঙচ’ ‘চট’ ইহারা সকলেই পরস্পর সমান, আর সেই সূত্রদিগের পরস্পর দূরত্ব ‘কছ’ বা ‘ছজ’ অথবা ‘ঙজ’ কিম্বা ‘চঝ’ ইহারাও পরস্পর সমান। অতএব এতাদৃশ যন্ত্রে একেক পাক ঘুরিয়া যাইলে বাস্তবিক ‘কখ’ প্রভৃতি স্থান গমন করা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা ‘কছ’ প্রভৃতি স্থান মাত্র উন্নত হওয়া হয়। অতএব ক্রম-নিম্ন ধরাতলে যেমন দৈর্ঘ্যকে বল দ্বারা, এবং উচ্চতাকে ভার দ্বারা পূরণ করিয়া গুণ-ফল সমান হইলেই সাম্যাবস্থা নিরূপিত হয়, এই স্থলেও অবশ্য সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ সূত্র-দূরত্বকে ভার দিয়া গুণ, আর সূত্রের বেষ্টনকে বল দ্বারা পূরণ করিয়া ঐ দুই গুণ-ফল সমান হইলেই স্ক্রু-যন্ত্রের সাম্যাবস্থা অবধারিত হইবে।

পরন্তু স্ক্রু-যন্ত্রের ব্যবহারে প্রায়ই উহার সহিত একটী দণ্ড যন্ত্রের সংযোগ থাকে তাহা হইলে বলের আরও লাভ হয়। ঐ দণ্ড যন্ত্রের ঘুরণে যে পরিধি হয় সেই
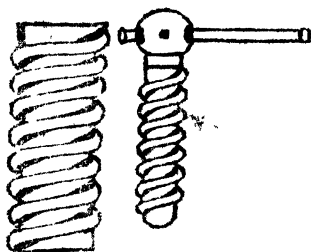
পরিধি-পরিমাণ দ্বারা বল গুণিত হয় আর সূত্র-দূরত্ব দ্বারা ভার গুণিত হয়। সুতরাং দণ্ড-যন্ত্রকে যত বড় করা যাইবে আর সূত্র দূরত্বকে যত অল্প করা যাইবে এই যন্ত্র দ্বারা ততই বলের লাভ হইতে পারে।

কিন্তু কার্য্যকালে এইরূপ হইয়া উঠে না। কারণ দণ্ড-যন্ত্রকে অধিক দীর্ঘ করিতে গেলে তাহাকে সঞ্চালন করা দুষ্কর হয় আর স্ক্রূ সূত্র দিগকে অধিক সূক্ষ্ম না করিলে পরস্পর নিকটবর্ত্তী করা যায় না। কিন্তু অধিক সূক্ষ্ম করিতে গেলেই ঐ সূত্র গুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং অল্প চাপ পড়িলেই ভাঙ্গিয়া যায়।

স্ক্রূ ব্যবহারে প্রায়ই দুইটী স্ক্রূ ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে একটীর সূত্র স্ক্রূর উপরিভাগে কাটা থাকে, আর একটী ঠিক্ তাহার বিপরীত-রূপ হয়। সেই দ্বিতীয় স্ক্রূর নাম আবরণ স্ক্রূ। ঐ আবরণ স্ক্রূ শূন্য-গর্ভ এবং তাহার সূত্র সকল ভিতরের দিকে থাকে। উহার যে স্থান উচ্চ প্রকৃত স্ক্রূর সেই স্থান নত। এইরূপে উহারা পরস্পর কামড়াইয়া বইসে। কোন কাষ্ঠে স্ক্রূ বিদ্ধ করিয়া পুন-

রায় তুলিয়া লইলে ঐ কাষ্ঠ-ছিদ্রে ঠিক্ স্ক্রুর দাগ পড়িয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দাগ যেমন দেখায় আবরণ স্ক্রুর ভিতরে অবিকল ঐ রূপ সূত্র কাটা থাকে।

স্ক্রু প্রয়োগের প্রথা নানা প্রকার। কোথাও আবরণটী স্থির থাকে প্রকৃত স্ক্রুটী তাহার ভিতর দিয়া যায়. কোথাও বা প্রকৃত স্ক্রু ঘুরেনা, কিন্তু আবরণটীকে ঘুরাইলেই উহা নামিতে উঠিতে পারে। এই উভয়বিধ স্ক্রুর নিম্নভাগে প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার 'কখ' স্থানে আবরণ স্ক্রু আছে। ঐ স্থান সরেনা, কিন্তু দণ্ড-যন্ত্র দ্বারা স্ক্রুতে পাক দিলে উহা স্বয়ং নামিয়া আইসে, সুতরাং ঐ স্ক্রুর মুখস্থিত 'গফ' ফলকের নিম্নস্থিত দ্রব্যবস্তুতে চাপ পড়ে।
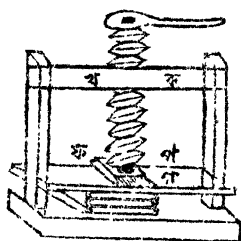
প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[অক্ষ চক্র—বিষম অক্ষ—বন্ধনী—দন্তুর চক্র-মুকুট দন্তুর—পার্শ্ব—দন্তুর—সরল দন্তুর—ধারক দন্তুর।]

দণ্ড-যন্ত্র অবলম্বের উপর ঘুরে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দণ্ড যন্ত্রের প্রয়োগ কালীন তাহার দীর্ঘ ভুজ দ্বারা একটী বৃহদ্বৃত্ত, এবং ক্ষুদ্র ভুজের দ্বারা একটী অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র বৃত্ত জন্মে। ঐ দুই বৃত্ত চিত্রিত করিলে, কিরূপ হয় নিম্নে তাহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। এই স্থলে বোধ হইতেছে যে, 'খক' দণ্ড 'অ'এর উপর ঘুরিয়া কখন 'ঝজ' ইত্যাকারে 'অ'এর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়াছিল। আর 'ক' স্থানে বল প্রয়োগ করাতে
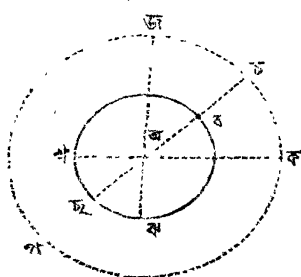
ভার এবং বলের যে সম্বন্ধ হইয়াছিল যখন ঐ 'ক' 'চ' স্থানে এবং 'খ' 'ছ' স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখনও সেই সম্বন্ধের কিছু মাত্র অন্যথা হয় নাই। অতএব যদি 'খক' একটী মাত্র দণ্ড না থাকিয়া 'অ' নামক অবলম্বের উপর 'খক'এর সমান যথা, 'ছচ' 'ঝজ' প্রভৃতি অনেক

গুলি দণ্ড থাকে এবং বল প্রয়োগ কালীন তাহার কখন একটিকে কখন অপরটীকে ধরিয়া বল প্রযুক্ত করা যায় তাহা হইলেও ফলের অন্যথা হইতে পারে না।

এই প্রকার যন্ত্রের নাম অক্ষ-চক্র। এই স্থলে দীর্ঘ ভুজের দ্বারা যে বৃত্ত জন্মে তাহাই চক্র, যথা 'কচজগ' এবং ক্ষুদ্র ভুজের দ্বারা যে বৃত্ত জন্মে তাহাই অক্ষ; যথা 'খছঝন'। এই যন্ত্রের সাম্যাবস্থা নিরূপণ করিতে হইলে দীর্ঘভুজ বা চক্রের ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বলের সহিত গুণ করিতে হয়, আর ক্ষুদ্র ভুজ বা অক্ষের ব্যাসার্দ্ধ লইয়া ভারের সহিত পূরণ করিতে হয়। ঐ দুই গুণ-ফল সমান হইলেই যন্ত্রের সাম্যাবস্থা জানা যায়। যেমন দণ্ড-যন্ত্রকে বল-মধ্যক করিলে বলের ক্ষতি হইয়া বেগের লাভ হয়, আর ভার-মধ্যক করিলে তাহার বিপরীত ঘটে অর্থাৎ বেগের ক্ষতি হইয়া বলের লাভ হয়, এই যন্ত্রেও অবিকল সেইরূপ ঘটে। অক্ষে বল এবং চক্রে ভার থাকিলে বেগের লাভ আর চক্রে বল এবং অক্ষে ভার থাকিলে বলের লাভ হয়।
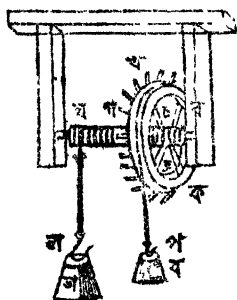
এই একটী অক্ষ-চক্র যন্ত্রের প্রতিকৃতি। 'কখগ' নামক চক্রের এক স্থানে এক গাছি রজ্জুর এক দিক জড়াইয়া বদ্ধ আছে। সেই রজ্জুর অন্য প্রান্ত 'প' নামক স্থান হইতে বল প্রদত্ত হয়। 'গঙ' নামক অপর এক গাছি রজ্জু

'ঘগচ' নামক অক্ষেতে 'বথর' রজ্জুর বিপরীত ভাবে জড়ান আছে। অতএব ঐ রজ্জু দ্বারা যে 'ভা' নামক ভার ঝুলিতেছে তাহা যদি যন্ত্রের বাম পার্শ্বে থাকে তবে চক্র বদ্ধ 'বথর' রজ্জু 'ব' নামক বলবদ্ধ সমেত যন্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে ঝুলিবে। এইরূপ হইলে যখন্ 'ব' আপন ভারে নামিবে তখন্ চক্র 'খগহ' অভিমুখে ঘুরিবে, অক্ষও ঐ চক্রের সহিত ঘুরিবে. সুতরাং 'মল' রজ্জু তাহাতে গুটাইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই 'ভা' উঠিতে থাকিবে। যদি এই স্থলে চক্রের ব্যাসার্দ্ধ ২ হাত অক্ষের আধহাত এবং বলের পরিমাণ /৪ সের হয় তবে ভার (২ × ৪ — ½ = ১৯ সের হইবে। এস্থলে যদি 'ব' কত নামিল এবং 'ভা' কত উঠিল ইহা পরিমাণ করিতে হয়, তবে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, 'ব'য়ের দড়ি ৪ হাত খুলিয়া আসিলে 'ভা'য়ের দড়ি ১ হাত মাত্র খুলিবে। অতএব দেখ যেমন বলে চতুর্গুণ লাভ হইতেছে তেমনি বেগ চারি ভাগ মাত্র পাওয়া যাইতেছে।
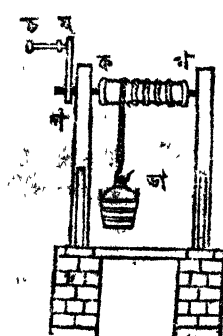
ইটীও একটী অক্ষ-চক্র যন্ত্রের প্রতিকৃতি। 'চঘ' নামক দণ্ড ধরিয়া ঘুরাইলে 'গঘ' দণ্ডটা ঘুরিতে থাকে, তদ্দ্বারা 'কখ'ও ঐ ঘর্ণনাভিমুখে ভ্রামিত হয়, সুতরাং যদি 'ভা' নামক ভারে বদ্ধ রজ্জু 'কখ' অক্ষে জড়ান থাকিয়া ঘর্ণনের বিপরীত দিক্ হইতে লম্বমান

থাকে তাহা হইলে ঐ রজ্জু অক্ষে যড়াইয়া ভার উন্নত হইয়া উঠে। এই যন্ত্রে চক্র দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া বুঝিলে 'গঘ' দণ্ডকেই চক্রের ব্যাসার্দ্ধ স্থানীয় বলিয়া বোধ হইবে। অতএব যদি 'গঘ' ২ হাত, অক্ষের ব্যাসার্দ্ধ $\frac{১}{২}$ হাত এবং বলের পরিমাণ/৪ সের বলিয়া অবধারিত হয়, তবে ভার (২ × ৪)—$\frac{১}{২}$=১৬ সের হইবে।
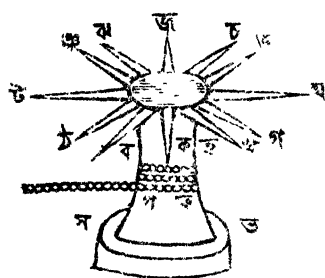
জাহাজের উপর এবং যে ঘাটে জাহাজ লাগায় এমন ঘাটে, এই প্রকার অশ্ব চক্র থাকে উহার মাথার চারিদিকে 'ক' 'খ' 'চ' 'ঝ' প্রভৃতি দণ্ড সকল আছে।

একং জন লোক উহার একংটা দণ্ড ধরিয়া পাক দিলেই 'বসভই' নামক অক্ষ ঘুরিতে থাকে। সুতরাং তাহাতে 'ফপ' নামক যে রজ্জু জড়ান থাকে তাহাও বিপরীত ভাবে গুটাইয়া আইসে এবং তদ্দ্বারা জাহাজের উপর লঙ্গর উঠে এবং জাহাজ ঘাটের কাছে আসিয়া থাকে। এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম "কাপষ্টান্" । ঐ শব্দের অপভ্রংশে এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে উহাকে 'কাপ্তান্'

বলে। এই যন্ত্রে কত বলে কতভার সাম্যাবস্থ হয় বিবেচনা করিতে হইলে যত গুলি লোকে যত বল দিয়া দণ্ড সকলে পাক দেয় তাহার সমষ্টি লইতে হয়। যদি কোন কাপ্তান-যন্ত্রের দণ্ড ৪ হাত পরিমিত হয় ও তাহার মধ্যস্থলের, অর্থাৎ অক্ষের ব্যাসার্দ্ধ $\frac{১}{২}$ হাত হয় আর তাহাকে ৫ জনে, প্রতি ব্যক্তি ৬ মণ পরিমিত বল দিয়া ঘুরাইয়া থাকে, তবে বলের পরিমাণ ৫ × ৬ = ৩০ মণ অবধারিত হইল। সুতরাং ভার (৩০ × ৪) ÷ $\frac{১}{২}$ = ২৪ মণ হইবে। ঘুড়ি উড়াইবার লাটাই, সূত্র গুটাইবার চরকি, এ সমুদায়ই অক্ষ চক্র যন্ত্র। উহাদিগের বাঁট অক্ষ এবং পেট চক্র। চরকাও একটী অক্ষ-চক্রের উদাহরণ স্থল। চরকার কাণ চক্রের কার্য্য করে, উহার ব্যাস সেই চক্রের অক্ষ হয় ঐ অক্ষ ঘুরিলে পাখি সমেত হাঁড়ি ঘুরে, সেই হাঁড়িও বাস্তবিক একটী চক্র মাত্র। পরে যাহা২ কথিত হইল তদ্দ্বারা অবশ্য বোধ হইয়া থাকিবে যে, এই যন্ত্রে চক্রকে যত বড় এবং অক্ষকে যত সরু করা যায়, ততই বেগের ক্ষতি ও বলের লাভ হয়। কিন্তু চক্র নিতান্ত বৃহৎ হইয়া উঠিলে উহা লইয়া কোন কার্য্যই করা যায় না। আর অক্ষও নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলে কিছু মাত্র ভার সহিতে পারে না, অথবা অত্যল্প মাত্র ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই বৈষম্য নিবারণার্থে একটী অতি সুন্দর উপায় অবধারিত হইয়াছে।
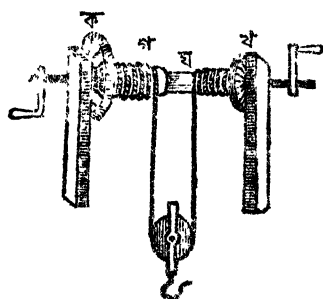
'কখ' অক্ষের এক ভাগ 'কগ'কে স্থূল করিতে হয় এবং অপর ভাগ 'ঘখ'কে অপেক্ষা-কৃত সূক্ষ্ম করিতে হয়। এই রূপ করিয়া এক গাছি দড়ি এমত রূপে যড়াইয়া দিতে হয় যে, তাহার এক দিক 'কগ' কে গুটাইয়া লইতে থাকিলে 'ঘখ' হইতে কিঞ্চিৎ২ খুলিয়া আইসে। এক্ষণে দেখ ঘুরিবার সময়ে সমুদায় অক্ষে একেবারে পাক লাগিবে, কিন্তু সেই এক পাকে 'কগ'যে যত দড়ি জড়াইয়া যাইবে 'ঘখ' হইতে কদাপি তত খুলিবে না, সুতরাং কপি-বদ্ধ ভার কিঞ্চিৎ উন্নত হইবে। ফলতঃ 'কগ' ভাগের পরিধি-প্রমাণ ঐ ভারের উন্নতি, আর 'ঘখ'য়ের পরিধি-প্রমাণ উহার অবনতি হইতে থাকিবে। অতএব 'কগ' ভাগের ব্যাসার্দ্ধ যত তাহা হইতে 'খঘ' ভাগের ব্যাসার্দ্ধ পরিমাণ বিযুক্ত করিলে যে সংখ্যা হয় সেই পরিমাণ ব্যাসার্দ্ধ একটী অক্ষ ব্যবহারের যে ফল, আর এই বিষমাক্ষ ব্যবহার করাতেও ঠিক্ সেই ফল হইবে। অথচ দেখ অক্ষকে অধিক সরু করিয়া অশক্ত করিতে হয় নাই।

যেমন অনেক গুলি দণ্ড-যন্ত্রকে একত্রিত করিয়া মিশ্র

দণ্ড-যন্ত্র প্রস্তুত করা যায় এবং তাহা করিলে অনেক প্রকার কার্য্যের সুবিধা হয়, সেই রূপ অনেক গুলি অক্ষ-চক্রের মিলনে মিশ্র অক্ষ-চক্র জন্মে, তাহার দ্বারাও কার্য্যের যথেষ্ট সৌকর্য্য ঘটিয়া থাকে। বিশেষ এই যে, দণ্ড-যন্ত্রের দ্বারা একেবারে অতি শীঘ্র অতি প্রবলতর চাপ পড়ে, মিশ্র-অক্ষ চক্র দ্বারা বহুক্ষণ ধরিয়া সমভাবে বল প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেই বলের পরিমাণ নিয়ম মিশ্র-দণ্ড-যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ যত গুলি চক্র থাকে তাহাদিগের ব্যাসার্দ্ধ সমস্তের গুন-ফলকে বল দ্বারা পূরণ করিবা এবং যত গুলি অক্ষ থাকে তাহাদিগেরও ব্যাসার্দ্ধ সমস্তের গুণ-ফলকে ভার দ্বারা পূরণ করিয়া ঐ দুই পূরণ-ফল সমান হইলেই যন্ত্রের সাম্যাবস্থা জানা যায়। মিশ্র অক্ষ-চক্র প্রস্তুত করিবার নানাবিধ উপায় আছে, তন্মধ্যে কএকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

একটী চক্র ঘুরিতেছে, যদি এক গাছি দীর্ঘ রজ্জু বা চর্ম্ম, অথবা শৃঙ্খল ঐ চক্রের গাত্রে বেষ্টিত করিয়া আর একটা চক্রের অক্ষে পরিবেষ্টিত করিয়া বন্ধন করা যায়, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় চক্রও ঘুরিতে আরম্ভ করে। চরকার টক্রু যে প্রকারে ঘুরে তাহা বিবেচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধ হইতে পারিবে। চরকায় হাঁড়ি ঘুরে এবং সেই হাঁড়িকে বেষ্টন করিয়া এক গাছি তাঁইত টক্রুতে পরিবেষ্টিত হয়, সেই তন্তু যোগেই টক্রুর ভ্রমণ হইতে থাকে।

এইরূপে যে রজ্জ্বাদি ব্যবহৃত হয় তাহার নাম 'বন্ধনী'। বন্ধনী সরল ভাবে দেওয়া যায় এবং ফের দিয়াও দেওয়া যায়। সরল ভাবে বন্ধনী পরিহিত করাইলে উভয় চক্রের গতি এক দিকে হয়, ফের দিয়া দিলে চক্রদ্বয় পরস্পর বিপরীত মুখে চলে।
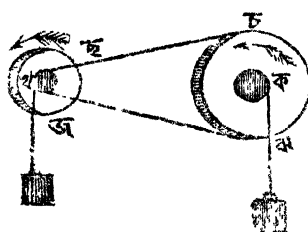
'ক' এবং 'খ' নামক দুই চক্র 'চছজঝ' নামক একটী সরল-বন্ধনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। যদি 'ক' নামক চক্রের গতি [illegible] শরাভিমুখে হইতে থাকে তবে 'খ' [illegible] শরাভিমুখে গমন করিবে। সুতরাং [illegible] উভয়ের গতি [illegible] দিকেই হইবে।
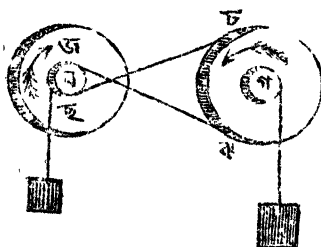
কিন্তু '[illegible]' নামক যে এই অপর দুই চক্র বিপর্য্যস্ত বন্ধনী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে তাহাদিগের গতি পরস্পর বিপরীত দিকে [illegible] শরাভিমুখে হয়। বন্ধনী দ্বারা গতি দূর হইতে [illegible] সংক্রমণ হইয়া থাকে। কোন যন্ত্রালয়ের ছাদের নিকট

যদি একটী চক্র বা অক্ষ-দণ্ড ঘুরিতে থাকে, বন্ধনী যোগে সেই গৃহের নীচের চক্রকেও তদ্দ্বারা ঘূর্ণিত করিতে পারা যায়—প্রাচীরাদিতে ছিদ্র করিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরেও ঐ গতি সংক্রামিত করা যায়—আর বন্ধনী সংযোগের প্রকার ভেদ করিলে এক প্রকার গতি হইতে নানা প্রকারের গতি উৎপাদন করা যায়।

কিন্তু যেখানে অল্প স্থানের মধ্যেই কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক হয়, সে স্থলে বন্ধনীর ব্যবহার অধিক হইতে পারে না। তথায় কার্য্য বুঝিয়া চক্রের প্রকার ভেদ করিতে হয়। যদি অধিক বলের আবশ্যকতা না থাকে তাহা হইলে চক্র গুলির ধার চর্ম্মাবৃত করিয়া গায়ে গায়ে লাগাইয়া রাখিলেই একটী ঘুরিলে সকল গুলি ঘুরে। চর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চর্ম্মের ঘর্ষণ হয়, ঘর্ষণ না হইলে কেবলমাত্র গায়ে ঠেকিয়া থাকিলেই একটি ঘুরিলে সকল চক্রগুলি ঘুরিতে পারে না।

সূতার কলে এইরূপ করে। তাহার প্রতিকৃতি এই।
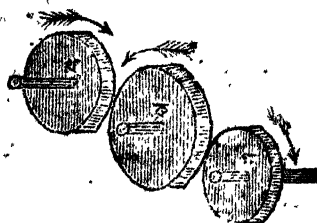
'ক' একটী বৃহৎ চক্র। উহার পার্শ্ব চর্ম্মে মোড়া। উহা ঘুরিলেই উহার পার্শ্বে যে, 'গ' 'খ' প্রভৃতি চক্র থাকে তাহারাও ঘুরে। ঐ সকল চক্রের মধ্য ভাগে

একটী টক্রু থাকে। তদ্দ্বারা সূত্র প্রস্তুত হয়।

কিন্তু গতি সংক্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপায় দন্তুর-চক্র। এক প্রকার দন্তুর-চক্রের প্রতিকৃতি এই। এই প্রতিকৃতি দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হইবে যে ‘খ’ চক্র শরাভিমুখে ঘুরিলে উহার ‘প’ দন্ত ‘ক’ চক্রের ‘চ’ দন্তকে নীচে
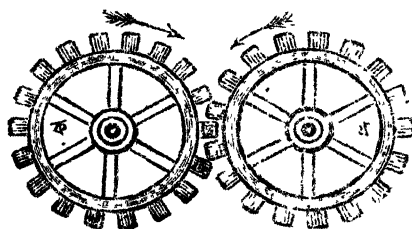
ঠেলিয়া দিবে তাহার পর ক্রমেই আবার ‘ফ’ আসিয়া ‘ছ’কে ঠেলিয়া দিবে, এবং ক্রমাগত এইরূপ হওয়াতে ‘ক’ চক্রটীও নিজ শরাভি-মুখে ভ্রামিত হইবে। দন্ত গুলির আকার এমন করা আবশ্যক যেন পরস্পর ঘর্ষণে ভগ্ন বা শীঘ্র ক্ষয় হইয়া না যায়। এই জন্য অধিক স্থলেই দন্তের আকার এমত করা যায় যেন, তাহারা পরস্পরে অধিক ঘর্ষণ না করিয়া গাড়ির চাকা রাস্তার উপর দিয়া যেরূপ গড়াইয়া যায়, সেই রূপ উপরে উপরে গড়াইয়া পড়ে।

কিন্তু ঐ প্রতিকৃতিতে চক্র দ্বয়ের দন্তগুলি যে প্রকার তাহা দেখিলেই বোধ হইবে যে, উহারা উভয়ে এক সমতলে থাকিলেই পরস্পর যোগে ঘূর্ণিত হইতে পারে। অর্থাৎ যদি ঐ দুই চক্র, গাড়ির চাকা যেমন খাড়া হইয়া

থাকে, সেই প্রকার, অথবা কুম্ভকারের চক্র যেমন শুইয়া থাকে সেইরূপে, পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্নিবেশিত হয় তাহা হইলেই ঐ রূপ দন্তর চক্রের কার্য্য হইতে পারে।
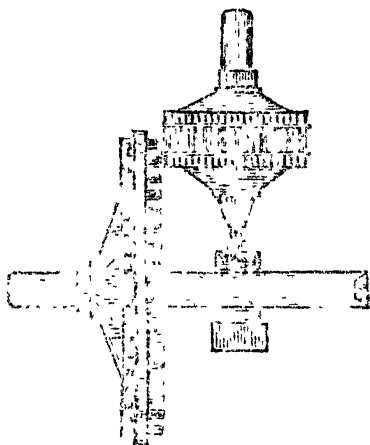
কিন্তু যদি এক খানি চক্রকে গাড়ির চাকার ন্যায় অর্থাৎ লম্ব ভাবে, এবং অপর চক্রকে কুমারের চক্রের ন্যায়, অর্থাৎ সম তলে ঘূর্ণিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার চক্র দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তজ্জন্য যে প্রকার দন্তর চক্রের প্রয়োজন তাহার নাম 'মুকুট দন্তর'। তাহার প্রতিকৃতি এই। 'ক' নামক চক্র মুকুট-দন্তর, 'খ' সামান্য দন্তর। 'ক' গাড়ির চাকার ন্যায় লম্বমানে ঘুরিতেছে। তাহার দন্ত যোগে 'খ' নামক চক্র কুম্ভকারের চ
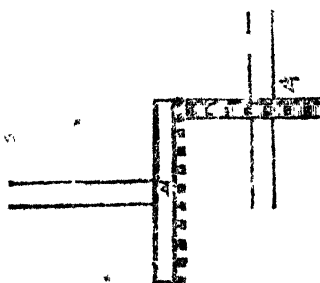
তাহার গমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করে না, কিন্তু চক্রটি অন্য দিকে ফিরিতে গেলেই ঐ দন্ত দ্বারা ধৃত হয়, সুতরাং উহা কোন প্রকারেই ফিরিতে পারে না।
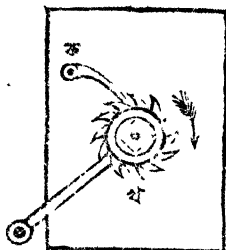
'ক' একটী উক্ত রূপ ধারক-দন্ত; 'খ' নামক দন্তুর চক্র যখন্ শরাভিমুখে ঘুরিতে থাকে তখন্ 'ক' তাহার ঘূর্ণন নিবারণ করে না, কিন্তু উহা বিপরীত দিকে ঘুরিতে গেলেই 'ক'এর মুখ 'খ'এর দন্তে বদ্ধ হইয়া যায়

বাষ্পীয়-যন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

ইয়ুরোপীয়দিগের নির্ম্মিত সর্ব্ব প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা বাষ্পীয় যন্ত্র অধিক কার্য্যে লাগে, বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রয়োগ প্রায় সকল কর্ম্মেই হইতে পারে। জলতুলা, গাড়ি টানা, জাহাজ টানা, সূত্র প্রস্তত করা, বস্ত্র বুনা পুস্তকাদি মুদ্রিত করা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম এক বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বাষ্পীয় যন্ত্রকে যেমন২ কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় ইহার প্রকৃতিও সেই রূপে কিঞ্চিৎ২ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। কিন্তু সেই সকল

উহার অবান্তর ভেদ মাত্র। বাষ্পীয় যন্ত্র মাত্রেরই মূল প্রকৃতি এক প্রকার। এই প্রকরণে তাহাই বর্ণিত হইবে, কিন্তু এই যন্ত্রের যে কএকটী প্রধান২ অঙ্গ আছে তাহার বিবরণ অগ্রে অবগত না হইলে সমুদায়টী একবারে হৃদ্গত করা কঠিন হয়, অতএব ক্রমশঃ একটী২ করিয়া এই যন্ত্রের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিবরণ করা যাইতেছে।

[বাষ্প কি?]

তাপ-বিজ্ঞানে এই প্রশ্নের উত্তর সবিশেষ করা যাইতে পারে, এইক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, তাপের একটী প্রধান ধর্ম্ম বিস্তারণ। যে দ্রব্য তাপসংযুক্ত করা যায় সেই বিস্তৃত হয়। কত তাপে কোন্ দ্রব্য কত বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন; এবং তাঁহারা এপ্রকার এক যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা কোন দ্রব্যে এখন্ কত তাপ আছে তাহা নিশ্চয় বলিতে পারেন। সেই যন্ত্রের নাম 'তাপমান-যন্ত্র'। তাপমান-যন্ত্র দ্বারা অবধারিত হয় যে, জলে ২১২ অংশ তাপ প্রবেশিত হইলেই জলের যোগাকর্ষণ শক্তি এমত ন্যূন হইয়া যায় যে, উহা তারল্য ভাব পরিহার পূর্ব্বক বায়বীয় ভাব ধারণ করে। জল সেই বায়বীয় ভাব প্রাপ্ত হইলেই তাহার নাম বাষ্প হয়।

জল যখন বাষ্প হয় তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়তন সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে,

জল বাষ্প হইলে পুর্ব্বায়াতনের ১৭২৮ গুণ অধিক বিস্তৃত হয়। সুতরাং যে পাত্রে জল থাকে তাহার সমুদায় জল বাষ্প হইলে উহা কদাপি আর সেই পাত্রে নিরুদ্ধ থাকিতে পারে না। তাহার বিস্তৃতি অধিক হওয়াতে বাষ্প ঐ পাত্রকে বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা পায়। এই জন্যই কখনং 'ভাপ্‌রার-হাঁড়ী' ফাটিয়া যায়—ভাতের হাঁড়ার মুখে কিয়ৎক্ষণ শরা চাপা থাকিলে সেই শরা উদ্ঘাটিন করিয়া বাষ্প বাহির হইতে থাকে—এবং বাষ্পের এইরূপ বলকেই অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয়দিগের বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরন্তু ২১২ তাপাংশে জল বাষ্প হয় বটে। কিন্তু যদি যেমন বাষ্প জন্মে অমনি বাহির হইয়া যাইতে পায় তাহা হইলে বাষ্পের বল অধিক হয় না। বাষ্পকে পাত্রের মধ্যে বদ্ধ করিয়া যদি জলে জ্বাল দেওয়া যাইতে থাকে তাহা হইলেই বাষ্পের বল অধিক হয়। ইহার কারণ এই যে, জলের উপর যত অধিক চাপ থাকে তত অধিক তাপাংশে তাহার বাষ্পোদ্গম হয় এবং যত অল্প চাপ থাকে তত অল্প তাপাংশে বাষ্প জন্মে। অল্প তাপাংশে যে বাষ্প জন্মে তাহার বিস্তারণ-শক্তি কখনই অধিক তাপাংশজাত বাষ্পের তুল্য হইতে পারে না। যেহেতু তাপের বিস্তারণ ধর্ম্মেই বাষ্পের বিস্তারণ গুণ জন্মে। সুতরাং তাপাংশের তারতম্যানুসারে বাষ্পেরও বিস্তারণ গুণের ন্যূনাধিক্য হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?।

[হাঁড়ি।]

যে পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নিসংযোগ দ্বারা সেই জলকে বাষ্প করা যায়, সেই পাত্রের নাম হাঁড়ি। বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ির গঠন নানা প্রকার হয়। কিন্তু গোলাকার হইলে জলের অধিক স্থানে তাপ পায় বলিয়া হাঁড়ির আকার শূন্য-গর্ভ গোল স্তম্ভের ন্যায় করাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

লৌহের বা তাম্রের অতি স্থূলং পাত প্রস্তুত করিয়া সেই সকল পাত যুড়িয়া বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু হাঁড়ি যতই শক্ত হউকনা কেন তাহার নীচে যেরূপ জ্বাল পায়, তাহাতে উহা অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সকলেরই বিদিত আছে, কোন মৃণ্ময় পাত্রকে চুল্লীর উপর সংস্থাপিত করিয়া যদি উহাতে কিয়ংক্ষণ জলাদি কোন পদার্থই না দেওয়া যায়, তাহা হইলে পাত্রটী অতি শীঘ্রই ফাটিয়া যায়। ধাতু পাত্রেও এইরূপ ঘটিতে পারে। ধাতু মাত্রেই অধিক উত্তপ্ত হইলে তাহার সহিত ভূবায়ুস্থিত অম্লকর-বায়ুর রাসায়নিক সংযোগ হয়। সেই সংযোগবশতঃ ধাতু মাত্রেই মড়িচা পড়ে এবং উহারা ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু যদি ধাতু পাত্রে জল থাকে, তবে পাত্রটা যতই কেন উত্তপ্ত হউক না, তাহার অধিকাংশ তাপ জলে যায়, এবং জলও বাষ্প হইয়া ঐ তাপকে অন্তর্হিত

করিতে থাকে। সুতরাং জল-পূর্ণ থাকিলে পাত্র বিদীর্ণ হয় না।

[জল-নিয়ামক।]

অতএব বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ি যাহাতে সর্ব্বদা জল-পূর্ণ থাকে এমত কোন উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। তন্নিমিত্ত অতি সুকৌশল পূর্ব্বক বাষ্পীয় হাঁড়িতে একটী যন্ত্র-বিশেষ সংযুক্ত থাকে। তাহার নাম 'জল-নিয়ামক' উহার প্রকৃতি নিম্ন বর্ত্তী প্রতিকৃতি দর্শনে স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবে।
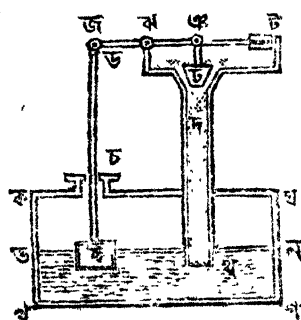
'কখগঘ' যেন বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ি। উহার উপরি ভাগে 'চ' নামক একটী ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া 'জচছ' নামক একটী দণ্ড প্রবিষ্ট থাকে। দণ্ডটী ঐ ছিদ্রে এমনি ঠিক্ হইয়া বইসে যে, কি বাহিরের বায়ু, কি হাঁড়ির ভিতরের বাষ্প, কিছুই উহা দ্বারা গমনাগমন করিতে পারে না। ঐ দণ্ডের নিম্নভাগে ধাতু নির্ম্মিত যে 'ছ' নামক শূন্যগর্ভ বস্তুটী আছে, তাহা হাঁড়ির জলে ভাসিতে থাকে। যখন্ জল কমিয়া যায় তখন্ ঐ 'ছ' ভারী হওয়াতে 'জচছ' নামক দণ্ডে

টান পড়ে। তাহা হইলেই 'জঝঞট' নামক দণ্ড-যন্ত্রের 'জঝ' ভুজ অধিক ভারী হওয়াতে অপর ভুজ 'ঝঞট' কিঞ্চিৎ উঠে। পরন্তু ঐ ভুজ উন্নত হইলেই উহার 'ঞ' স্থানে যে 'ট' নামক সিপি বদ্ধ থাকে তাহাও উন্নত হয়। সুতরাং 'দথ' নামক প্রণালীর মুখ উন্মুক্ত হওয়াতে সেই প্রণালীর দ্বারা 'ট'এর উর্দ্ধবর্ত্তী-পাত্রস্থিত জল গিয়া হাঁড়ির ভিতরে পড়ে।

জল হাঁড়ির ভিতর পড়িলেই আবার 'ছ' ভাসিয়া উঠে, 'ছ' ভাসিয়া উঠিলেই 'চজ' দণ্ড উন্নত হয়, এবং উহা উন্নত হইলেই 'ঝট' ভুজ নামে। আর সেই ভুজ নামিলেই সিপি নামিয়া 'দথ' প্রণালীর মুখ বন্ধ হইয়া যায়। আর অধিক জল হাঁড়ির ভিতর যায় না।

(আরক্ষ কবাট।)

বাষ্পীয় হাঁড়ি কেবল অগ্নিতাপেই নষ্ট হইতে পারে এমত নহে। উহার ভিতর যে বাষ্প জন্মে তাহার বিস্তারণ শক্তি সমধিক হইয়া উঠিলে হাঁড়ি বিদীর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যেমন অগ্নিতাপ নিবারণের নিমিত্ত জল-নিয়ামক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে সেই রূপ এই দ্বিতীয় আশঙ্কা নিরাকরণার্থ আর এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই যন্ত্রের নাম আরক্ষ-কবাট।
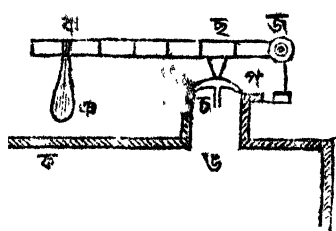
'কঙ' হাঁড়ি; 'ঙ' উহার একটী ছিদ্র, সেই ছিদ্রের মুখে 'চ' নামক কবাট রুদ্ধ আ-ছে। আর 'জছঝ' একটী দণ্ড-যন্ত্র উহার অবলম্বস্থান 'জ' এবং 'ছ' স্থানে একটী বিপর্য্যস্ত ত্রিকোণ-সূচী আছে যদ্দ্বারা দণ্ড যন্ত্রটী 'চ' নামক কবাটের উপর ভার দিয়া থাকে। দণ্ডের অপর প্রান্তে 'ঞ' নামক কোন ভারী দ্রব্য ঝুলিয়া আছে।

যখন্ হাঁড়ির অন্তর্গত বাষ্পের বল অধিক হয়, তখন্ উহা 'চ' নামক কবাটিকে ঠেলিয়া তুলে, এবং সেই পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। 'জছঝ' দণ্ডটী তুলাযন্ত্রের ন্যায় অঙ্কিত আছে। 'ঞ' ভারকে তাহার যেমন স্থানে আনা যায় সেই পরিমাণ বাষ্পের চাপ হইলে কবাট খুলে। এইরূপে যত বলের বাষ্প প্রস্তুত করা আবশ্যক সেই পরিমিত বলেরই বাষ্প জন্মাইতে পারা যায়।

সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে এই আরক্ষ-কবাটের দ্বারা বাষ্পীয় হাঁড়ির রক্ষা হয় এবং তজ্জাত বা-ষ্পের বলও কখন কত থাকে তাহা জানিতে পারা যায়। পরন্তু এই দুইএর মধ্যে হাঁড়ির রক্ষাই এই কবাটের মুখ্য তাৎপর্য্য—বাষ্পের বল জানিবার উপায়ান্তর আছে।

সেই যন্ত্রের নাম বাষ্প-মাপক; উহার প্রতিরূপ নিম্ন-ভাগে প্রদর্শিত হইতেছে।

[বাষ্প-মাপক।]
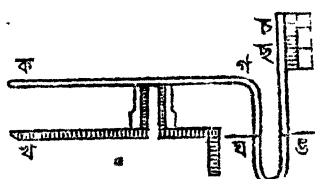
'খ' বাষ্পীয় হাঁড়ি। উহা হইতে 'গঘঙছচ' নামক একটী কাচ নির্ম্মিত বক্রনল বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই নল পারদে পরিপূর্ণ এবং তাহার উপরের দিক খোলা। যদি হাঁড়ির ভিতর হইতে যে বাষ্প আইসে তাহার চাপ বাহিরের বায়ুর চাপের সমান হয় তাহা হইলে উক্ত পারদ 'গঘ' নল ভাগে যত উন্নত হইয়া থাকে 'চঙ' নল ভাগেও ঠিক্ তত উচ্চ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ক্রমে বাষ্পের চাপ যত অধিক হইতে থাকে ততই 'গঘ'এর দিকে পারা নত হইয়া আইসে এবং 'চঙ'এর দিকে উন্নত হইয়া উঠে। 'ঘ' অপেক্ষা 'ঙ'এর দিকে পারা যত ইঞ্চি অধিক উন্নত হইয়া উঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর বাষ্পের চাপ তত পোয়া হইতেছে জানিতে পারা যায়।

[জল-মাপক।]

পূর্ব্বে যে 'জল-নিয়ামক' যন্ত্রের বিবরণ করা গিয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হইয়া থাকিবে, যে বাষ্পীয় হাঁড়িতে জা-

পন্না হইতেই জল যোগায়, সুতরাং হাঁড়ি কখনই জল-শূন্য হইতে পারে না। বাস্তবিক তাহাই হয় বটে; ঐ যন্ত্র দ্বারা হাঁড়ির ভিতর সর্ব্বদাই উপযুক্ত পরিমাণে জল থাকে। কিন্তু বিজ্ঞ যন্ত্রকরেরা, পাছে জল-নিয়ামক যন্ত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটে, এই শঙ্কা প্রযুক্ত হাঁড়ির ভিতরে জল কখন্ কত আছে ইহা প্রত্যক্ষ করিবার আর একটী উপায় করিয়াছেন। তাহার নাম 'জল-মাপক'। উহার প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

'খগঘ' বাষ্পীয় হাঁড়ি। উহাতে যেন 'চছ' পর্য্যন্ত জল থাকা আবশ্যক, তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে 'ঝ' নামক একটী ছিদ্র আছে আর কিঞ্চিৎ-দূর্দ্ধে 'জ' নামক আর একটী ছিদ্র আছে। ঐ দুই ছিদ্রে 'জঞঝ' নামক একটী কাচ-নির্ম্মিত বক্র নল বসাইয়া দিলে, হাঁড়ির ভিতরে জল যে পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া আছে কাচের নলেও ঠিক তত উচ্চ হইয়া থাকিবে। সুতরাং হাঁড়িতে কত দূর পর্য্যন্ত জল আছে তাহা বাহিরের কাচ নল দেখিয়াই জানিতে পারা যায়। ঐ 'জঞঝ' নলেরই নাম 'জল মাপক'।

[তাপ-নিযামক।]

বাষ্প, সকল সময়ে সমান পরিমাণে প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না। কখন অধিক কখন অল্প বাষ্পের আবশ্যকতা হয়। এই নিমিত্তে মধ্যেং চুল্লীর তাপ কখন ব-

র্দ্ধিত আর কদাপি হ্রস্ব করা আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই কার্য্য সাধনার্থে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার নাম 'তাপ-নিয়ামক'। 'কট' হাঁড়ি, 'ঠট' চুল্লী। হাঁড়ির ভিতর 'কচ' নামক একটী নল প্রবেশিত আছে। হাঁড়ির ভিতরে জলের উপর বাষ্পের চাপ যত অধিক হয়, জল ঐ নলের ভিতর
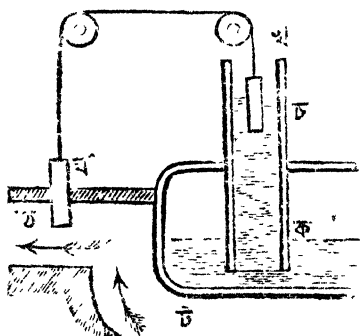
দিয়া ততই উচ্চ হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ জলের উপরি-ভাগে 'ঘখখ' রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া কোন শূন্য-গর্ভ ধাতু-পাত্র ভাসমান আছে। জল উত্থিত হইলে তাহার সহিত ঐ পাত্রও উত্থিত হয় এবং উহা উঠিলেই 'খখঘ' রজ্জু শ্লথ হইয়া যায়, সুতরাং ঐ রজ্জুর অপর প্রান্তে যে 'ঠ' নামক ধাতুময় পীঠ আছে তাহা নামিয়া চুল্লীর মুখ বদ্ধ করে। চুল্লীর মুখ বদ্ধ হইলেই আর তাহার ভিতর অধিক বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ু প্রবেশ অল্প হইলেই চুল্লীর জ্বলনও হ্রস্ব হয়। এই রূপে চুল্লী ক্ষণকাল স্তিমিত-তেজঃ হইয়া থাকিলেই হাঁড়ির ভিতর অল্প বাষ্প জন্মে তাহাতে উহার অন্তর্গত জলের উপর চাপ কমিয়া যায়, সুতরাং নলের ভিতরকার জলও নামিয়া আ-

ইসে এবং তাহার সহিত 'ভাসমান ধাতু-পাত্র'ও নামে, আর 'ঐ পাত্র' নামিলেই 'ঠ' উঠিয়া চুল্লীর মুখ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—সুতরাং তাহাতে পুনর্ব্বার বায়ু প্রবেশ হওয়াতে উহা অধিক পরিমাণে জ্বলিয়া পুনর্ব্বার সমধিক বাষ্প জন্মায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাষ্পীয় হাঁড়ির প্রধান২ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থূল২ বিবরণ কথিত হইল, এক্ষণে ঐ বাষ্পীয় হাঁড়ি-জাত বাষ্পকে যে, কিরূপ করিয়া কার্য্য-সাধনোপযোগী করা যায় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

কোন যন্ত্র দ্বারা যে রূপ কার্য্য সাধন করা আবশ্যক হউক না কেন, তদ্দ্বারা এক বার চক্র-গতি উৎপাদন করিতে পারিলেই অপর সকল ক্রিয়া সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব বাষ্পের বিস্তারণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে চক্রগতি উৎপাদিত হইয়াছে এস্থলে তাহাই বলা যাইবে। কিন্তু কেবল চক্রগতি উৎপন্ন হইলেই হয় না। সেই চক্রগতির সর্ব্বাবস্থাতে সমান বেগ করিয়া রাখাও আবশ্যক, কারণ সমবেগ না হইয়া একবার অধিক বেগ এবং একবার অল্প বেগ হইলে কোন কার্য্যই সুনির্ব্বাহিত হয় না; আর যন্ত্রটীও অতি শীঘ্র জীর্ণ এবং ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব বাষ্পীয় যন্ত্রের 'গতি-নিয়ামক' যে২ অতি উৎকৃষ্ট উপায় সমস্ত অবলম্বিত হইয়াছে এই প্রকরণে তাহারই স্থূল২ বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

ষ্ঠিকা এবং 'চভ' উহার 'যোজক-দণ্ড'। ঐ কাষ্ঠিকা এবং যোজক-দণ্ড একটী সুবৃহৎ চক্রে সংযুক্ত হয় এবং তাহা হইলে যেরূপ দেখায় তাহাও ঐ প্রতিকৃতিতে দৃষ্ট হইবে।

সেই স্থলে 'দশ' নামক ক্র্যাঙ্কের যোজক-দণ্ড শরাভি-মুখে উত্থিত হইলেই 'কখগ' নামক চক্রটী স্বপার্শ্বস্থ শরাভিমুখে ভ্রামিত হয়; আবার 'ক্র্যাঙ্ক'টী 'হপম' আকারে অবস্থিত হইলে 'হপ' যোজক-দণ্ডের শরাভি-মুখে নিম্ন গতি হওয়াতে চক্রও স্বপার্শ্ববর্ত্তী শরাভিমুখে ঘুরে।

এইরূপে যোজক-দণ্ডের গতি ক্রমশঃ উপর নীচে হই-লেই চক্র ভ্রামিত হয়। কিন্তু ঐ ভ্রমণের মধ্যে ক্র্যাঙ্ক দুইবার এমত দুই স্থানে উপস্থিত হয় যে তথায় 'ক্র্যাঙ্কের' বল কোন কার্য্য-কারী হইতে পারে না। তাহার এক স্থান, যখন্ ক্র্যাঙ্কের কাষ্ঠিকা যোজক-দণ্ডের ঠিক নীচে আইসে এবং অপর স্থান, যখন্ উহারা উভয়ে এক সরলারেখায় আসিয়া চক্রের ব্যাস স্বরূপে অবস্থিত হয়। ঐ দুই সময় 'ক্র্যাঙ্কের' টানে চক্র না ঘুরিয়া উহার অক্ষে, অর্থাৎ মধ্য স্থানে সমুদায় বল পড়ে। হাতে করিয়া একটী যাঁতা ঘুরাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে। যদি হাত না ঘুরাইয়া কেবল কাঠীকে ঠেলিয়া এবং টানিয়া অক্লেশে যাঁতা ঘুরাইবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে, যে দুইবার যাঁতার কীলক এবং কাষ্ঠিকার মাথা ও হস্তের কফোণি সমসূত্রপাতে হয় সেই দুইবার হাতের টান

যাঁতার কেন্দ্র-স্থিত কীলকের উপরে পড়ে, ঐ টানে যাঁতা ঘুরিতে পারে না। 'ক্র্যাঙ্কে'ও এইরূপ হইতে পারে। এবং এই জন্যই ক্র্যাঙ্কের উক্ত দুই অবস্থাকে 'অকর্ম্মণ্যাবস্থা' বলা গিয়া থাকে। যাঁতাকে আস্তেং ঘুরাইতে গেলে এইরূপ হয় বটে, কিন্তু যদি উক্ত যাঁতাকে অত্যন্ত বেগে ঘূর্ণিত করা যায় তাহা হইলে কীলকের প্রতি আকর্ষণ হয় না। অর্থাৎ যাঁতা একবারও অকর্ম্মণ্যাবস্থায় অবস্থিত না হইয়া ঐ দুই স্থান হইতে বেগে বাহির হইয়া পড়ে। জড় পদার্থের নিশ্চেষ্টতা গুণই এইরূপ হইবার এক মাত্র কারণ।

কোনং বাষ্পীয় যন্ত্রে দুইটি 'ক্র্যাঙ্ক' সংযুক্ত থাকে। তাহারা এমন্ত ভাবে অবস্থিত হয় যে, একটার অকর্ম্মণ্যাবস্থায় অপরটী কার্য্যকারী হইয়া চক্রের ঘূর্ণন সম্পাদন করে। ক্র্যাঙ্কদ্বয় পরস্পর ৯০ অংশ অন্তর থাকিলেই এইরূপ ঘটিতে পারে।

(দণ্ডা।)

'ক্র্যাঙ্ক' যন্ত্রটী উর্দ্ধাধোভাবে সঞ্চালিত হইলেই চক্রের ঘূর্ণন হয় ইহা বোধগম্য হইয়া থাকিবে। এই স্থলে ক্র্যাঙ্কের গতি কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহার বিবরণ করা আবশ্যক।

সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে, ঢেঁকির একদিকে পায়ে করিয়া চাপিয়া ধরিলে তাহার অপর দিক উন্নত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ অবলম্ব-মধ্যক-দণ্ড-যন্ত্র মাত্রেরই এই

প্রকৃতি যে, উহার এক দিক নত হইলে অপর প্রান্ত উন্নত হয়। ক্র্যাঙ্কের যোজক-দণ্ড ঐ রূপ একটী অতি বৃহৎ দণ্ড-যন্ত্রের এক প্রান্তে সংলগ্ন থাকে। সেই দণ্ডের নাম 'আড়া'। ক্র্যাঙ্ক এবং চক্র সমন্বিত আড়ার প্রতিকৃতি ৮৫ পৃষ্ঠে প্রদর্শিত হইয়াছে।

'কখ' আড়া; 'গ' উহার অবলম্ব: 'খজ' ক্র্যাঙ্কের যোজক-দণ্ড এবং 'চঘঙ' চক্র আর 'ঝ' সেই চক্রের অক্ষ। আ-ড়ার 'ক'এর দিক নত হইলে 'খ'এর দিক্ উঠে আর 'ক' উন্নত হইলে 'খ' নত হয়। সুতরাং পর্য্যায়ক্রমে 'খ' নতোন্নত হইলেই 'ক্র্যাঙ্ক' সংযোগে 'চঘঙ' চক্র এবং 'ঝ' তাহার অক্ষ ঘুরিতে থাকে। আড়ার অপর দিক, অর্থাৎ 'ক'এর দিক্ কিরূপে সঞ্চালিত হয় তাহা পরে বলা যাইবে।

[সমান্তরাল-গতি-নিয়ামক।]

বল-মধ্যক-দণ্ডযন্ত্রের দুই প্রান্ত সরল রেখাক্রমে সঞ্চা-লিত হয় না। উহার উভয় দিক্ই ধনুরাকার পথে গমন করে। দেখ 'ঙঘ' দণ্ড-যন্ত্র যদি 'ঙ' অবলম্বের উপর পরি-চালিত হইয়া 'বঙ' ভাবে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহার দুই প্রান্ত অবশ্য ধনুরাকার পথে গমন করিবে। অ-র্থাৎ ঐ দুই পথ
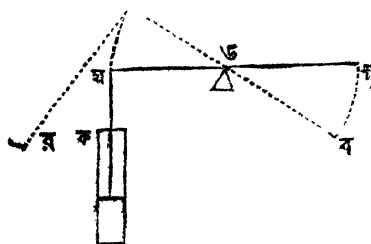
ঙ
ঘ
দ
য
ক
ব

সরল রেখা হইবে না—দুইটীই বৃত্ত-পরিধির অংশ হইবে। অতএব যদি 'ঘ'এর দিকে একটী যষ্টি বন্ধন করিয়া দেওয়া যায় তবে সেই যষ্টিও কদাপি ঋজুরেখাক্রমে উত্থিত বা পতিত হয় না। 'ঘ' উত্থিত হইলে ঐ যষ্টির প্রান্ত 'র' স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাষ্পীয় যন্ত্রে একটী চুঙ্গীর ভিতর অর্গল সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যেরূপ কথিত হইল তাহাতে অবশ্য বোধ হইয়া থাকিবে যে, সেই অর্গলকে কেবল আড়ের মুখে বাঁধিয়া দিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই হেতু বিজ্ঞবর ওয়াট্ সাহেব 'সমান্তরাল-গতি-নিয়ামক' নামে একপ্রকার অতি বিচিত্র উপায় সৃষ্ট করেন। নিম্ন-বর্ত্তী প্রতিকৃতি দেখিলে তাহার প্রকৃতি স্পষ্ট বোধ হইবে।
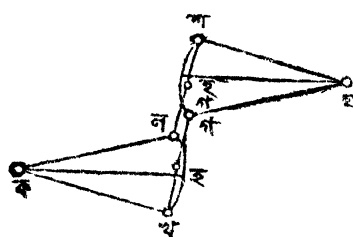
'কখ' এবং 'গঘ' দুই দণ্ড, উহারা পরস্পর সমান এবং আপনা-পন কীলকের অর্থাৎ 'ক' এবং 'ঘ' এর চতু-র্দ্দিকে ঘুরিতে পারে আর তাহাদিগের উভয়ের 'খ' এবং 'গ' প্রান্ত ভাগ 'গখ' দণ্ড দ্বারা সংযুক্ত আছে, 'হ' ঐ যোজক-দণ্ডের মধ্য স্থান। দেখ, যদি 'কখ' এবং 'ঘগ' উভয়েই একেবারে ঘুরিয়া প্রথমটীর মুখ 'ল' পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় টীর মুখ 'শ' পর্য্যন্ত উঠে তাহা হইলে 'গখ' দণ্ডও উহাদিগের

সহিত উঠিয়া 'লশ' রেখাক্রমে অবস্থিত হইবে; তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, 'গখ'এর 'খ' প্রান্ত 'ল স্থানে যাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে, কিন্তু 'গ'ও 'শ' স্থানে যাওয়াতে ঠিক সেই পরিমাণে বাম দিকে গিয়াছে। সুতরাং 'গঘ' দণ্ডের মধ্য ভাগ, অর্থাৎ 'হ' স্থান সরল রেখাক্রমেই চালিত হইয়াছে। ফলতঃ ঐ স্থান পার্শ্বের দিকে সরে না, কেবল নতোন্নত ভাবেই চালিত থাকে।

এক্ষণে বাষ্পীয় যন্ত্রের আড়াতে কি প্রকারে উক্ত দণ্ড সকল সংযুক্ত হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট করা যাইতেছে। এই পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিকৃতিতে 'কখ' এবং 'ঘগ'
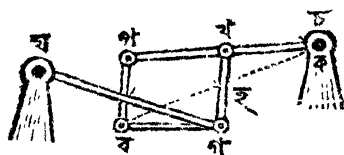
স্বং কীলকের উপর চালিত হইলে 'খগ' যোজক-দণ্ডের মধ্যস্থান 'হ' ঠিকসরল রেখায় চালিত হয়। পরন্তু 'পব' 'খগ' রেখার সমান এবং সমান্তরাল আর 'বগ'ও 'পখ'এর সমান এবং সমান্তরাল আর 'পব' যে দিকে যেমন সরে 'খগ'ও সেই দিকে তেমনি সরে, সুতরাং 'পবগখ' চতুর্ভুজ-ক্ষেত্রটী সকল সময়েই সমান্তরাল থাকিয়া যায়, সুতরাং 'হ' স্থানের গতি যেরূপ হয় 'ব' স্থানের গতিও সেইরূপ হয়। পরন্তু 'হ'এর গতি সরল রেখাক্রমে হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, অতএব 'ব'এরও তাহাই হয়। ফলতঃ ঐ 'ব'

স্থানে বাষ্পীয় যন্ত্রের চুঙ্গীর অর্গল বদ্ধ থাকে আর 'হ' স্থানে একটী বায়ু-ও-জলনির্যাণ-যন্ত্রের অর্গল বদ্ধ থাকে। সুতরাং সেই উভয় অর্গলেরই গতি সরল রেখাক্রমে হয়।

[বাষ্পীয় চুঙ্গী এবং অর্গল।]

নিম্নবর্ত্তী প্রতিকৃতির দাক্ষণ ভাগে বাষ্পীয় চুঙ্গী এবং তাহার অর্গলের প্রতিরূপ প্রকাশিত আছে। এই চিত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ 'পত' চুঙ্গী এবং 'বত' তাহার
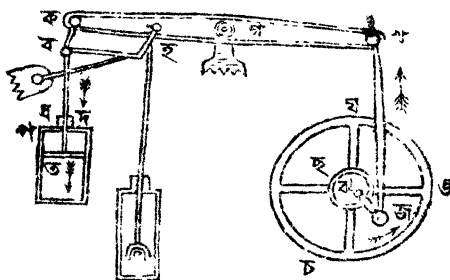
অর্গল। ঐ চুঙ্গী লোহ নির্ম্মিত এবং শূন্যগর্ভ। উহার ভিতর অর্গল এমত রূপে প্রবিষ্ট আছে যে, তাহাতে বায়ু বা বাষ্প কিছুরই গমনাগমনের পথ নাই। বিশেষতঃ চুঙ্গীর মুখে 'ধ' নামক আর একটী পাত্র থাকে তাহা তৈল, বসা প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য দ্বারা পরিষিক্ত সূত্রনস্যে পরিপূর্ণ। উহারই ভিতর দিয়া অর্গল চুঙ্গীর মধ্যে প্রবেশ করে সুতরাং বাষ্প বা বায়ু কিছুই ভিতর হইতে

বাহিরে বা বাহির হইতে ভিতরে যাইতে পারে না। পূর্ব্বে যে বাষ্পীয় হাঁড়ির বিবরণ করা গিয়াছে সেই হাঁড়ি হইতে একটী নল আসিয়া চুঙ্গীর ভিতর প্রবিষ্ট হয়; বাষ্প ঐ নল দিয়া হাঁড়ি হইতে চুঙ্গীতে আইসে এবং একবার অর্গলের নীচে যাইয়া আপন প্রবলতর বিস্তারণ শক্তি প্রভাবে অর্গলকে ঠেলিয়া তুলে, আবার অর্গল কিয়দ্দূর উঠিলেই বাষ্প উহার উপরের দিকে যাইয়া অর্গলকে নামাইয়া দেয়। এইরূপে অর্গলটী এক বার উঠে এবং একবার নীচে আসিতে থাকে। সুতরাং অক্ষ ও মুগুর দ্বারা নতোন্নত হয়।

(পিচ্ছিলকবাট এবং ডি-কবাট।)

বাষ্প কি প্রকারে একবার অর্গলের নীচের দিকে যায় এবং কেমন করিয়াই বা তৎপরক্ষণে উহার উপরের দিকে আইসে ইহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। বাষ্পীয় যন্ত্রের সর্ব্ব অবয়বই অতি সুকৌশল-সম্পন্ন বটে, কিন্তু অন্যাপেক্ষা এই ভাগটীর বিশেষ চমৎকারিত্ব আছে এবং ইহাকে কেবল চিত্র দ্বারা স্পষ্ট করাও অতি কঠিন। বাষ্পের উর্দ্ধাধোগতি দুইটী কবাট সংযোগে সম্পন্ন হয়; তাহার একটীর নাম, 'পিচ্ছিল-কবাট' এবং দ্বিতীয়টীর নাম 'ডি-কবাট'। উহাদিগের চিত্র পর পৃষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে।

পরবর্ত্তী (অর্থাৎ ৮৭ এবং ৮৮ পৃষ্ঠের) চিত্রদ্বয়ের প্রথম টীতে বাষ্প কি প্রকারে আসিলে অর্গলের ঊর্দ্ধগতি হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 'ন' উহার বাষ্পনলী, ঐ নলী দ্বারা হাঁড়ি হইতে বাষ্প আসিতেছে আসিয়া আর কোন দিকে পথ না পাইয়া 'ম' নামক পিচ্ছিল-কবাট এবং 'ল' নামক ডি-কবাটের নীচে যে বক্র শর চিহ্নিত ছিদ্র আছে তদ্দ্বারা চুঙ্গীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে। বাষ্প অর্গলের নীচে আসিলেই তাহার বিস্ফারণ শক্তি প্রভাবে অর্গলের মুখ উন্নত হইয়া উঠে। কিন্তু কিয়দ্দূর উঠিলেই উহার উপরিভাগে 'চ' স্থানে যে ত্রিভুজ দণ্ড-যন্ত্র বদ্ধ আছে তাহার 'চ' প্রান্ত উন্নত হয়। 'চ' উঠিলেই 'ঝ' অবশ্য যেন অপর দিকস্থ বাহুর প্রান্ত ভাগে 'ঞ' নামিতে থাকে। 'ঞ' নামিয়া আসিলে 'পম' দণ্ডটীও নামে, উহা নামিলেই পিচ্ছিল কবাট নামিয়া আসিয়া পরবর্ত্তী (৮৮ পৃষ্ঠের) প্রতিকৃতিতে যে ভাবে আছে সেই ভাবে অবস্থিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বে নিম্নস্থিত যে প্রনালীর মুখ মুক্ত ছিল তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব বাষ্প আর ঐ দিক দিয়া প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এইরূপে বাষ্প পূর্ব্ববৎ 'ন' দ্বারা আসিয়া পিচ্ছিল কবাটের উপর দিয়া 'য' প্রণালী দ্বারা চুঙ্গীর ভিতর প্রবেশ করে এবং

অর্গলের মুখের উপরিভাগে চাপ দেয়। সুতরাং অর্গল নামিয়া আসিতে থাকে। আবার অর্গল নামিতে২ 'চ' নত এবং 'জ' উন্নত হয় সুতরাং পিচ্ছিল-কবাট সেই সহযোগে ঊর্দ্ধে উঠে। কিয়দ্দূর উঠিলেই 'র' প্রণালী মুক্ত এবং 'ম' প্রণালী রুদ্ধ হয়। অতএব প্রথম প্রতিকৃতিতে
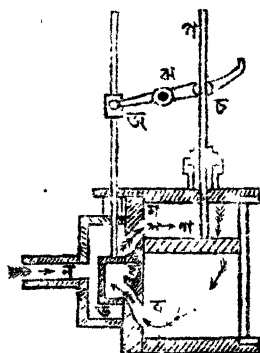
যে প্রকারকার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে সেই রূপ ক্রিয়া হইতে থাকে। এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে পুনঃ২ হওয়াতে অর্গলের ঊর্দ্ধাধোগতি সম্পাদিত হয়।

পরন্তু যখন অর্গলের মুখ যে দিকে উঠিবে সেই সময় যদি উহার বিপরীত দিকে বাষ্প বদ্ধ থাকে তবে সেই বাষ্পের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত অর্গলের কোন দিকেই গতি হইতে পারে না। এই বৈষম্য নিবারণের জন্য অতি সুকৌশল পূর্ব্বক বাষ্প বহির্গমনের একটী পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রতিকৃতিটী (৮৭ পৃষ্ঠের) দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বোধ হইবে যে, যখন অর্গল উপরের দিকে উঠিতেছে, তখন উহার ঊর্দ্ধ ভাগে স্থিত বাষ্প শরাভিমুখে যাইয়া পিচ্ছিল-কবাট এবং ডি-কবাটের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হয়; কিন্তু পিচ্ছিল কবাটের দ্বারা চতুর্দ্দিক আবৃত থাকাতে অন্য কোন দিকে পথ না পাইয়া ঐ ডি-কবাটে যে 'হ' নামক ছিদ্র আছে তাহারই দ্বারা

বাহির হইতে থাকে। আবার যখন অর্গল নামিয়া আইসে (৮৮ পৃষ্ঠের) তখনও নীচের বাষ্প 'র' প্রণালী দিয়া ডি কবাটের পশ্চাদ্ভাগে যায় এবং তথা হইতে 'হ' ছিদ্র দ্বারা বাহির হয়।

বাষ্প চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া কি হয় তাহা পরে কথিত হইতেছে।

বাষ্প-সংঘাতক।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে বাষ্পীয় যন্ত্রের অবান্তর ভেদ অনেক আছে। কিন্তু তন্মধ্যে প্রধান ভেদ দুইটী। এক প্রকার যন্ত্রে বাষ্প, চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া বায়ুতে যায়, আর এক প্রকার যন্ত্রে বাষ্পের তাদৃশ অপব্যয় হয় না— বাষ্প চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া একটা বৃহৎ পাত্রের অন্তর্গত হয় এবং সেখানে সংহত হইয়া পুনর্ব্বার জল হইয়া থাকে। ঐ পাত্রের নাম বাষ্প সংঘাতক।
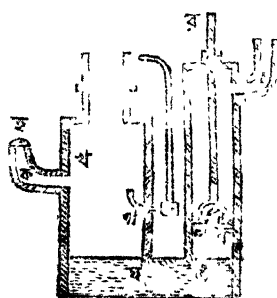
'ক' নামক প্রণালী দ্বারা চুঙ্গীর বাষ্প 'খ' নামক একটি লৌহময় বৃহৎ পাত্রে প্রবিষ্ট হয়। ঐ 'খ'এর চতুর্দ্দিকে শীতল জল থাকে এবং 'গ' নামক প্রণালী দ্বারা উহার ভিতরেও শীতল জল প্রবিষ্ট হইতে থাকে, বাষ্প সেই

শীতল জল সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া যায়। 'খ' নামক বাষ্প-সংঘাতকের তলভাগে 'ঘ' নামক একটী কবাট সংস্থাপিত আছে। সেই কবাট এরূপ যে, কেবল বাহিরের দিকেই খুলে, কদাপি ভিতরের দিকে খুলে না। বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইলে 'ঘ' কবাট উন্মুক্ত হয় এবং জল তৎক্ষণাৎ ঐ দ্বার দিয়া 'ঙ' নামক চুঙ্গীর ভিতরে প্রবেশ করে।

[বোমাযন্ত্র।]

উক্ত 'ঙ' নামক চুঙ্গীর ভিতর (৮৯ পৃষ্ঠে) 'পফর' নামক একটী অর্গল আছে। সেই অর্গলের মুখে 'প' এবং 'ফ' নামক দুইটী কবাট থাকে। তাহারা কেবল ঊর্দ্ধদিকেই খুলিতে পারে নীচের দিকে খুলেনা। 'পফর' অর্গলের অগ্রভাগ বাষ্পীয় যন্ত্রের আড়ার এক স্থানে সংযুক্ত থাকে। আড়ার সেই দিক উঠিলেই ঐ অর্গল উঠে। উহা উঠিলেই 'ঘ'এর পশ্চাদ্ভাগ শূন্য হয়। সুতরাং ভিতরকার জল-বাষ্পাদির চাপে ঐ কবাট খুলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ 'ঙ' স্থান ঐ সকল পদার্থে পরিপূর্ণ হয। আবার যখন আড়ার নিম্নগতি বশতঃ বোমার অর্গল নামিয়া আসিতে থাকে তখন 'ঙ' পাত্রস্থিত জল-বাষ্পাদির প্রতি উপর হইতে চাপ পড়াতে বোমার মুখের 'প' এবং 'ফ' নামক দুইটী কবাট খুলিয়া যায়। সুতরাং 'ঙ' স্থিত তাবৎ দ্রব্য উপরে উঠে। উপরে উঠিয়া উহা 'চ' নামক প্রণালী দ্বারা চলিয়া যায়। ঐ 'চ'ই বাষ্পীয় হাঁড়ির জল-যোজক

প্রণালী। সুতরাং ইহাতে যে জল পড়ে তাহা পুনর্ব্বার বাষ্পীয় হাঁড়িতেই যায়। কি চমৎকার! একবার যে জলকে বাষ্প করাতে সেই বাষ্পের বিস্তারণ-শক্তি প্রভাবে চুঙ্গীর অর্গল পরিচালিত হইয়াছিল, সেই জলই পুনর্ব্বার বাষ্প সংঘাতক-যন্ত্র মধ্যে আসিয়া জল হইল এবং বোমা দ্বারা উত্তোলিত হইয়া প্রণালী সহকারে পুনর্ব্বার হাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। এইরূপ বারম্বার হইতে থাকিল। অতএব যদি শীতল-জল-সেক ব্যতিরেকে বাষ্প সংঘাতের উপায়ান্তর থাকিত তবে এইরূপ বাষ্পীয় যন্ত্রে একবার জল লইলে পুনর্ব্বার জল গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বে যাহার কথিত হইয়াছে তৎসমুদায় স্মরণ থাকিলে অবশ্যই বোধ হইবে যে, বাষ্পীয় যন্ত্র উক্ত সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্বিত হইলেই কার্য্যসাধনোপযোগী হয়। দেখ, চুল্লীর তাপে হাঁড়ির মধ্যে বাষ্প হইতে থাকিল, জলনিয়ামক-যন্ত্র ঐ হাঁড়িতে প্রয়োজনানুরূপ জল যোগাইতে লাগিল, বাষ্প-বাহিনীনলী দ্বারা বাষ্প, চুঙ্গীতে প্রবিষ্ট হইল এবং সেই চুঙ্গীর পিচ্ছিলকবাট এবং ডিকবাটের দ্বারা বাষ্প একবার চুঙ্গীর উপরের দিকে এবং পরে নিম্নভাগে যাইয়া চাপ প্রদান করিল। তাহাতেই চুঙ্গীর অর্গল উপর নীচে করিয়া পরিচালিত হইল, ও তৎসহযোগে

আড়ার এক দিকের উর্দ্ধাধোগতি সম্পাদিত হওয়াতে উহার অপর দিকও চালিত হইল, সুতরাং যোজক এবং ঘূর্ণন দণ্ড সহকারে অক্ষের ও তৎসম্বন্ধ চক্রের ভ্রমণ হইতে লাগিল; আর বাষ্প ও চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া সংঘাতক-যন্ত্রে গিয়া পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হইয়া বোমাযন্ত্র দ্বারা উত্তোলিত হইলেই পুনর্ব্বার জলযোজক প্রণালী দ্বারা বাষ্পের হাঁড়িতে আগমন করিল।

তবে আর বাকী কিছুই নাই বোধ হয়; ফলতঃ তাহা নহে। বাষ্পীয় যন্ত্রের গতিনিয়ামক অপর প্রধান তিনটী অঙ্গ আছে। তাহাদিগের প্রকৃতি অবগত হওয়া আবশ্যক। না হইলে এই অতি সুকৌশল-সম্পন্ন যন্ত্রের সকল আশ্চর্য্য কৌশল অবগত হওয়া হয় না।

সেই তিনটীর মধ্যে একটীর নাম বিষম কৈন্দ্র-চক্র—দ্বিতীয়টীর নাম 'গবর্ণর' এবং তৃতীয় টীর নাম উড্ডীনচক্র। ঐ তিনটীর বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত করা যাইতেছে।

[বিষম-কৈন্দ্র-চক্র।]

একটী চক্রাকার কাষ্ঠ খণ্ড লও, সেই কাষ্ঠ-খণ্ডের কেন্দ্রের কিয়দ্দূরে একটী ছিদ্র কর। পরে ঐ চক্রের চতুর্দ্দিকে একটী অঙ্গুরীয় পরিহিত করিয়া দেও। অঙ্গুরীয়টী যেন চক্রের গায়ে অধিক আঁটিয়া না বইসে অথচ পার্শ্বের দিকে এমন রূপে বদ্ধ থাকে যেন কোন প্রকারে খসিয়া না পড়ে। পরে ঐ অঙ্গুরীয়ের দুই দিকে দুইটী দণ্ড বদ্ধ করিয়া সেই দণ্ড দ্বয়ের মুখ একত্র সংযুক্ত কর। এইরূপ

করিয়া যদি চক্রের ছিদ্রে একটী কীলক বদ্ধ করিয়া তৎ সহযোগে ঐ চক্রকে ঘূর্ণিত করিতে থাক তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, চক্রটী যত ঘুরিতে থাকিবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড দ্বয়ের মুখও সঞ্চালিত হইয়া একবার চক্রের দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিবে আবার তাহার পর কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিবে। সুতরাং চক্রটী ক্রমাগত এক দিকে ঘুরিলেও উক্ত দণ্ড দ্বয়ের মুখ ভাগ সরলরেখা ক্রমে গমনাগমন করিতে থাকিবে।

এইরূপ যন্ত্রকে বিষম-কৈন্দ্র চক্র বলা যায়। এই চক্র বাষ্পীয় যন্ত্রের অক্ষে নিবেশিত থাকে এবং সেই অক্ষের সহিত ঘুরে। ইহা দ্বারাই পিছিল কবাটের গতি সম্পাদিত হয়। উহার প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।
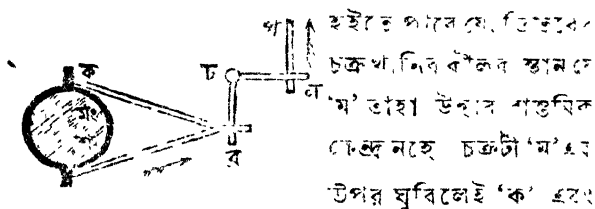
এই চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, চিত্রের চক্রখানির কীলক স্থান যে 'ম' তাহা উহার বাস্তবিক কেন্দ্র নহে। চক্রটী 'ম'এর উপর ঘুরিলেই 'ক' এবং তন্নিম্নবর্ত্তী স্থানে যে দণ্ডদ্বয়ের দুই প্রান্ত সংলগ্ন আছে তাহা এক বার নীচে এবং তাহার পর উপর দিকে উঠিতে থাকে, সুতরাং দণ্ডদ্বয়ের মুখ অর্থাৎ 'র' স্থান এক বার সরিয়া আইসে আবার চলিয়া যায়, তাহাতেই 'রক-লপ' মিশ্র-দণ্ড যন্ত্রের 'লপ' ভাগের উর্দ্ধাধোগতি সম্পা

দিত হইতে থাকে। ঐ 'লপ' স্থানেই বাষ্পীয় চক্রীর অন্তর্গত পিচ্ছিল-কবাট সংযুক্ত হয়। সুতরাং উহাও তৎসহযোগে চলিতে থাকে।

— —

[গবর্ণর।]

গতি-নিয়ামক গবর্ণর নামক দ্বিতীয় যন্ত্রের প্রকৃতি ইহা অপেক্ষাও অধিক চমৎকারজনক। গবর্ণর শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্তা। বস্তুতঃ এই যন্ত্রটী সমুদায় বাষ্পীয় যন্ত্রের শাসনকর্তৃ স্বরূপই হইয়া থাকে ইহাদ্বারা বাষ্প যোগের পরিমাণে, চক্রীর ভিতর যাহা—এক বার অধিক এবং এক-বার অল্প যাইতে পারে না, সুতরাং বাষ্পীয় যন্ত্রের গতিও বিষমবেগে নিষ্পন্ন হয় না। পার্শ্বভাগে ইহার একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।
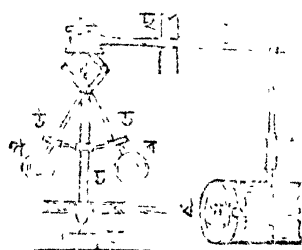
এই চিত্রের দক্ষিণভাগে 'গবর্ণর' এবং বামভাগে 'কখ' নামক বাষ্প-বাহিনী নলী দৃষ্ট হইতেছে, ঐ নলীর মুখে 'গ' নামক একটী কবাট এমত ভাবে নিবেশিত আছে যে 'ঙ' নামক দণ্ডের ঊর্দ্ধ গতি হইলে সেই কবাট ঐ নলীর মুখে ক্রমশঃ বদ্ধ হইয়া যায় এবং 'ঙ'এর নিম্নগতি হইলে উহা অল্পে২ খুলিতে থাকে। ঐ 'ঙ' নামক দণ্ড 'চছ' নামক অপর একটী দণ্ডের এক দিকে সংলগ্ন আছে

এবং ঐ 'চছ' দণ্ডের অপর প্রান্ত চিত্রের দক্ষিণভাগে যে গবর্ণর যন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে তাহার শীর্ষদেশে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং যদি গবর্ণরের শিরোদেশ কোন কারণে নতোন্নত হইতে থাকে তবে 'ছচ' দণ্ডের যোগে 'ঙ' দণ্ডও তদ্বিপরীতভাবে পরিচালিত হইবে, সুতরাং তৎ সংশ্লিষ্ট 'গ' নামক কবাটও আপনাহইতেই কখন বা বদ্ধ এবং কখন বা উন্মুক্ত হইবে। পরন্তু 'গ' নামক কবাট বদ্ধ হইলেই বাষ্পের পথ রুদ্ধ হইয়া যন্ত্রের দ্রুত বেগ নিবারিত হয় এবং ঐ কবাট উন্মুক্ত থাকিলেই বাষ্পের পথ প্রশস্ত হওয়াতে যন্ত্রের গতিও দ্রুতবেগে সম্পাদিত হইতে পারে। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে গবর্ণরের নিম্নভাগে যে চক্রটী আছে তাহাকে এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের অক্ষকে এই উভয়কে পরিবেষ্টন করিয়া একটা রজ্জু আছে, সুতরাং অক্ষের ঘূর্ণনে ঐ রজ্জু সংযোগে চক্র এবং তৎসহ গবর্ণরের 'চ' নামক মেরু-দণ্ডও ঘুরিতে থাকে। অতএব অক্ষটী অধিক বেগে ঘুরিলে উক্ত মেরুদণ্ডও সাতিশয় বেগসহকারে ঘূর্ণিত হয়। পরন্তু তাহা হইলেই 'প' এবং 'ব' নামক দুইটী লৌহময় গোলাও ঘুরিতেং চক্রভ্রমণ-জনিত কেন্দ্রবিমুখ-বলের প্রাদুর্ভাবে মেরুদণ্ডের নিকট হইতে দূরে অপসৃত হইতে থাকে। কিন্তু যেমন কাঁচির মুখদ্বয় পরস্পর দূরবর্ত্তী হইলে তাহাদিগের শিরোভাগ নত হইয়া কীলকের নিকটে আইসে গবর্ণরের ঐ দুই গোলা পরস্পর দূরীভূত হইতে থাকিলেও উহাদিগের শীর্ষদেশ সেই

রূপে নীচ হইয়া আইসে। সুতরাং 'চছ' দণ্ডের যে প্রান্ত সেই শীর্ষদেশে সম্বদ্ধ আছে, তাহাও নামিয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারাই বাষ্পীয় নলীর মুখ 'গ' কবাট দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায়। কিয়ংক্ষণ সেই কবাট রুদ্ধ থাকিলে চুঙ্গীর ভিতর বাষ্প অল্প হয়, সুতরাং অর্গলের এবং তৎসঙ্গ আড়ার ও তদ্দ্বারা ক্র্যাঙ্কের এবং ক্র্যাঙ্কের যোগে অক্ষের বেগ কমিয়া আইসে। অনন্তর অক্ষের বেগ রজ্জু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া 'গবর্ণরের' যেরূপ বেগ জন্মিয়াছিল তাহাও ম্লান হয়, সুতরাং 'প' এবং 'ব' নামক গোলা দুইটী পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়, এবং তাহা হইলেই গবর্ণরের শীর্ষদেশ উন্নত হইয়া উঠে, আর তাহা উঠিলেই 'ছচ' দণ্ডের যোগে পুনর্ব্বার 'গ' খুলিয়া যায় এব বাষ্পের পথ মুক্ত হইয়া যন্ত্রের বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

[উড্ডীনচক্র।]

গতি-নিয়ামক তৃতীয় যন্ত্রের নাম উড্ডীন-চক্র। ইহা একটী লৌহময় সুবৃহৎ চক্র মাত্র। ইহা বাষ্পীয় যন্ত্রের অক্ষে সংলগ্ন থাকে এবং তাহার সহযোগে ভ্রামিত হয়। বাষ্পীয় যন্ত্রের অর্গলের গতি যদিও সর্ব্ব সময়ে সমবেগে নিষ্পাদিত না হইবার নানা কারণ উপস্থিত হয়, তথাপি এই সুবৃহৎ উড্ডীন-চক্রটী একবার ঘূর্ণিত হইলে তাহার গুণেই অক্ষের ভ্রমণ সর্ব্বদা সমবেগে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই চক্রটীই বাষ্পীয় যন্ত্রের 'বল-ভাণ্ডার' স্বরূপ হইয়া আছে। যখন বাষ্পীয় যন্ত্রে বল অধিক

ের তাহার অনেক ভাগ যেন এই স্তবৃহৎ চক্রের ভ্রামণেই নাস্ত হইয়া থাকে, আবার যখন বাষ্পীয় যন্ত্রের বল হ্রস্ব হইয়া আইসে, তখন এই চক্রের সম্মিকে-২ কলা প্রবৃত্ত তাহার বল হঠাৎ হ্রস্ব না হওয়াতে তাহা হইতেই প্রয়োজনানুরূপ বল অক্ষে সঞ্চরিত হয়। ফলতঃ জড় পদার্থের যে স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতা গুণ আছে তাহাই এই যন্ত্রের কার্য্যকারিতার একমাত্র কারণ। উড্ডীন চক্রের প্রতিকৃতি ইহার পূর্ব্বে (৮৫ পৃষ্ঠে) আড়ার প্রতিকৃতির সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপসংহার।

বাষ্পীয় যন্ত্রের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিবরণ স্বতন্ত্র২ রূপে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সম্মুখ ভাগে উক্ত যন্ত্রের একটী সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহার 'চ' স্থানে চুল্লী 'খ' স্থানে বাষ্পীয় হাঁড়ি, 'গ' জল মাপক '' বাষ্প-মাপক, 'ধ' স্থলে রক্ষক কবাট, 'ফ' জল-নিয়ামক 'খধ' বাষ্পীয় নলী, 'ঝঝ' জল-প্রণালী, 'গ' চুঙ্গী, 'ভ' অর্গলের মুখ, 'ওখ' স্থলে সম স্বরাল-গতি-নিয়ামক যন্ত্র, 'এঘ' বাষ্প সংঘাতক, 'ণ' বোম 'খকচ' আড়া, 'চ' ক্রাঙ্ক, 'জজ' উড্ডীন চক্র, 'ছ' গবর্ণর, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।